পথের কথা

ভ্রমণ কাহিনী

শ্রীফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

দশ আনা।

প্রকাশক ;

শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়,

বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী— ২০১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট।

কলিকাতা ;

২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে.

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

রাসবিহারি,

তুমি দেশ দেখিতে বড় ভালবাস। তাই আজ তোমাকে কতকগুলি দেশের সংবাদ দিলাম—আশা করি পড়িয়া খুসী হইবে। 'পথের কথা' হইলেও তোমার কাছে ঘরের কথা অপেক্ষা বেশি ভাল লাগিবে।

কলিকাতা
১৫ই ভাদ্র, ১৩১৮

তোমার বাবা।

নিবেদন

যাঁহার ভ্রমণকাহিনী পড়িতে পড়িতে হৃদয় আনন্দে, আগ্রহে ভরিয়া উঠিত আজ সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁহাকে সুহৃদ্ভাবে লাভ করিয়া যে নিজেকে কতটা ধন্য মনে করি, তাহা ব্যক্ত করিবার মত কথা আমার নাই। তারপর তিনি 'পথের কথার' ভূমিকা লিখিয়া আমাকে চিরদিনের জন্য অচ্ছেদ্য ঋণ-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। সে ঋণ পরিশোধ করিবার মত ত শক্তি আমার নাই। সুতরাং সেজন্য তাঁহাকে দুইটী মৌখিক ধন্যবাদ না দিয়া আমার অন্তরে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলে অনেকটা তৃপ্তি অনুভব করি।

আমার আত্মীয় ও সাহিত্যিক বন্ধু শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, মহাশয় 'পথের কথার' আগাগোড়া প্রুফ্ দেখিয়া দিয়াছেন। সুবোধবাবু ও বঙ্গবাসীর সুযোগ্য সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু মহাশয়দিগের আগ্রহ ও যত্ন না থাকিলে বোধ হয় এত শীঘ্র 'পথের কথা' প্রকাশ করিতাম না। তাঁহাদের উভয়ের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ। 'পথের কথা' সামান্য হইলেও আশা করি সুধী পাঠকগণের নিকট অনাদরের কথা হইবে না।

কলিকাতা
১৫ই ভাদ্র ১৩১৮

শ্রীফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
দেওঘর ও তপোবন	১
এটোয়া	১৫
কাল্‌কা পথে	২৫
বালেশ্বরে আট দিন	৫৭
খুরদা	৭২
চক্রধরপুর	৮৬

ভূমিকা।

দেশে এত লোক থাকিতে শ্রীযুক্ত ফকিরবাবু আমাকে ধরিয়া বসিলেন, তাঁহার "পথের কথা"র ভূমিকা আমাকে লিখিয়া দিতে হইবে। আমি না ভাবিয়া, না বুঝিয়া স্বীকার করিয়াছিলাম। এখন কাগজ কলম লইয়া বসিয়াছি, কিন্তু কি লিখিব ভাবিয়া পাইতেছি না।

শ্রীযুক্ত ফকিরবাবুর পরিচয় প্রদানই কি ভূমিকা লিখিবার উদ্দেশ্য? তাহা হইলে সে প্রয়োজন ত ইতঃপূর্ব্বেই সিদ্ধ হইয়াছে। তাঁহার 'ঘরের কথা' অনেকেই পড়িয়াছেন, অনেকেই প্রশংসাও করিয়াছেন; সুতরাং সাহিত্য-ক্ষেত্রে যিনি এতদূর পরিচিত, তাঁহার আবার নূতন করিয়া কি পরিচয় দিব? তারপর ফকিরবাবু এই যে 'পথের কথা' লিখিয়াছেন, তাঁহার অনেক কথা পূর্ব্বেই সাময়িক পত্রাদিতে প্রকাশিত হইয়াছে; অতএব 'পথের কথার'ও পরিচয় অনাবশ্যক।

'পথের কথার' পরিচয় অনাবশ্যক হইতে পারে, কিন্তু পথের পরিচয়ের আবশ্যক আছে। পথে সকলেই চলে, পৃথিবীতে এমন কে আছে যে একদিনও পথে চলে নাই? পৃথিবীতে আসিলে পথে চলিতেই হইবে; ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক সকলকেই পথে নামিতে হইবে। যে এই সংসার-পথে 'পথের কথা' জানিয়া নামে সে সুপথে চলিয়া যায়, আর যে 'পথের কথা' না জানিয়া আমার মত নামিয়া পড়ে, সে একপথে সাতবার যায়; অবশেষে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া যে দিকে দুই চক্ষু যায় সেই দিকে চলিয়া যায়।

তাহার দীর্ঘ ভ্রমণ বৃথা হয়। এই জন্যই পথের পরিচয়ের আবশ্যক আছে।

আমাদের ফকিরবাবুর এই পুস্তকে পথের কথা আছে—সুপথেরই কথা আছে; তাই অনেকে বিশেষ আগ্রহপূর্ব্বক তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনী পাঠ করিয়া থাকেন। ছেলেবেলায় একখানি ইংরাজী পুস্তকে একটা গল্প পড়িয়াছিলাম, তাহার নাম "Eyes and No-eyes"। তখন গল্পটা সোজাসুজি পড়িয়াছিলাম; এখন ভাবিয়া দেখিতেছি কথাটা ভারি সত্য। চক্ষু থাকিলেই হয় না—দেখিবার মত হৃদয় চাই, দেখিবার মত শিক্ষা চাই, দেখিবার মত সাধনা চাই। ফকিরবাবুর তাহা আছে। তাই তাঁহার পথের কথা লোকে এত আগ্রহসহকারে শুনিয়া থাকেন। আমিও এককালে পথিক ছিলাম, কিন্তু দেখিতে পারি নাই। আমি কুরুক্ষেত্রের মাঠ ঘুরিয়া শুধু বনজঙ্গল দেখিয়াছি এবং ক্লান্ত হইয়া 'লোটাভর' জল খাইয়াছি; আর ফকিরবাবু রেলগাড়ীর জানালার ভিতর দিয়া কুরুক্ষেত্রের দূরবিস্তৃত প্রান্তর দেখিয়া সমাধিস্থ হইয়াছিলেন; তিনি তাঁহার নয়নসম্মুখে গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুনকে দেখিয়াছিলেন, মহাবীর ভীমসেনকে দেখিয়াছিলেন, নর-নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়াছিলেন, আর কুরু-পাণ্ডবের সমরসজ্জা দেখিয়াছিলেন। ইহারই নাম দেখা। এমন করিয়া দেখিতে জানেন বলিয়াই ফকিরবাবুর বর্ণনা পড়িয়া লোকে আনন্দ লাভ করে।

কেহ কেহ বলেন, ফকিরবাবুর ভ্রমণকাহিনীতে বর্ণনার কিঞ্চিৎ বাহুল্য দৃষ্ট হয়। আমি তাঁহাদের সহিত এক মত হইতে পারিলাম না। 'হাবড়ায় গাড়ীতে চড়িলাম, সমস্ত রাত্রি পরে প্রাতঃকালে

মোকামায় নামিলাম,' ইহা ভ্রমণ বটে,—ভ্রমণবৃত্তান্ত নহে। রাস্তায় বৰ্দ্ধমান ষ্টেসনে যে সুন্দর সীতাভোগ খাইয়াছিলাম, গাড়ীর মধ্যে একজন তামাকখোর যে কলিকার আগুন ছড়াইয়া ফেলিয়া লঙ্কাকাণ্ডের আয়োজন করিয়াছিল, ইত্যাদি, যদি না বলিলাম, তবে আর ভ্রমণবৃত্তান্ত হইল কৈ? সে যে ভূগোলবিবরণ হইল।

ফকিরবাবু একটী ভুল করিয়াছেন। তিনি যদি 'ঘরের কথার' পর 'পরের কথা' লিখিয়া তাহার পর 'পথের কথা' অবশেষে 'পারের কথা' লিখিতেন তাহা হইলে বেশ সামঞ্জস্য রক্ষা পাইত। ঘর ছাড়িয়াই 'পথে' নামিয়া তিনি ভাল কাজ করেন নাই। এ ভ্রম আর সংশোধিত হইবার নহে। ফকিরবাবু 'পথের' খোঁজ পাইয়াছেন, 'পথের' সঙ্গী পাইয়াছেন। ভগবানের নিকট প্রার্থনা ফকিরবাবুর 'পথের কথা' পড়িয়া লোকে যেন পথের সন্ধান পায়।

শ্রীজলধর সেন।

পথের কথা।

দেওঘর—তপোবন।

তখন ইস্কুলে পড়ি। সংসারের কোনো সংবাদই রাখি না। বাবা জলখাবারের পয়সা দেন, আমি বাঁচাইয়া ঘুড়ি-লাটাই কিনি। ইস্কুল হইতে বাড়ী ফিরিতে ফিরিতে, পথে দাঁড়াইয়া ট্রামগাড়ির অবাধ্য অশ্বের দুরন্তপনা হাঁ করিয়া দেখি। গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অযথা বিলম্বের হেতু অন্বেষণ করিয়া মা কত বুঝান। ঠিক সেই অবস্থায় আমাদের পাশের বাড়ীর প্রতিবেশিনীরা একদিন সকালবেলা, একখানি সেকেণ্ড-ক্লাস গাড়ির মাথায় বিছানা-পত্র বোঝাই দিতে-ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে আমার একজন বাল্যবন্ধু। সে, সাহেব সাজিয়া খুব ব্যস্ততার সহিত একবার গাড়ির ভিতর উঠিতেছিল, পরক্ষণেই নামিয়া অকারণ বাড়ীর অভ্যন্তরে যাইয়া তখনই ছেঁড়া খাঁতা হাতে পুনরায় ঘুরিয়া আসিতেছিল। আমার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইতেই সে সহাস্যে ছুটিয়া আসিয়া জানাইল তাহারা গ্রীষ্মাবকাশে "দেওঘর" বেড়াইতে যাইতেছে। তারপর সে নিজেই দেওঘরের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিতে লাগিল। সেখানে কেমন পাহাড় আছে। পাহাড়ের উপর কত রকম গাছ—সে সব গাছে, আবার কত প্রকার ফল হইয়া রহিয়াছে ; যাহার খুসী সেই পাড়িতে পারে, কেহ মানা করে না। তাহাদের বাড়ীর নিকটেই নদী। সে দুপুর-বেলা সেই নদীর ধারে ধারে খেলা করিয়া বেড়ায়। নদীতে হাঁটুজলও নাই। তাহার কিছুমাত্র ভয় করে না। তাহাদের বাড়ীতে বসিয়া

ত্রিকূট পাহাড় দেখা যায়। সে কেমন সুন্দর! আকাশের গায়ে যেন আঁকা ছবি। সেখানকার পথগুলি কেমন ঢেউখেলান। সে একদিন ঘুড়ি উড়াইয়া পাহাড়ে ঠেকাইয়া দিয়াছিল। আমি অবাক্ হইয়া তাহার কথা শুনিলাম। শুনিতে শুনিতে সেই অজ্ঞাত দর্শনের জন্য কেমন একটা আকাঙ্ক্ষা মনের মধ্যে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সেই নিস্তব্ধ নির্জ্জন পাহাড়ের বক্ষে ফলভারাবনত তরুচ্ছায়ায় বসিবার বাসনা আমাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিল। নদী-সৈকতে, বাড়ীর মত, 'খেংরাকাটি' দিয়া বহুদূর বিস্তৃত রেল-লাইন পাতিবার ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠিল। আমার অনেকগুলি সূতার 'কাটিম' সঞ্চিত ছিল; সে গুলির সমষ্টিতে যে একখানি বড় রেলগাড়ি সৃজন করিতে পারিব ইহা ভাবিয়া আনন্দে অধীর হইয়া উঠিলাম। বন্ধু হাসিতে হাসিতে "দেওঘর" চলিয়া গেল। আমি বাড়ী ফিরিয়া গিয়া মার কণ্ঠ জড়াইয়া বলিলাম,—"মা, আমি দেওঘর যাব।" মা বলিলেন "বড় হও, তার পর তখন যাবে।" মার কথার প্রতিবাদ করিয়া উত্তর করিলাম,—ও ত বড় হয় নাই, ও কেন গেল?" "ওঁরা বড়লোক, ওঁরা পারেন।" মার সেই সজল নয়ন ও স্নেহ-করুণ ছবি আজও আমার প্রাণে অঙ্কিত রহিয়াছে। আজ তিনি কোথায়! আজ যে তাঁর আশীর্ব্বাদবাণী পরিপূর্ণ হইয়াছে। পশ্চিমে বেড়াইতে আসিয়া যখন প্রকৃতির সুষমা, সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া আত্মহারা হইয়া পড়ি, যখন নদীর লীলাতরঙ্গে, সুনীল নভোমণ্ডলে স্বর্ণমেঘের আনাগোনা দেখি, যখন পাহাড়ের কণ্ঠ বেড়িয়া ঘনকৃষ্ণমেঘরাজি পাহাড়ের শিরঃ চুম্বন করে ও সোনার আলোক-হাসিতে বিশ্ব চমকিত করিয়া তোলে, তখন মনে হয়—মা, আজ তুমি কোথায়? ঐ যে মেঘের মধ্যে সুবর্ণের দীপ্তি, ও কি তোমার আনন্দহাসি? ঐ যে নদীসলিলে লীলাতরঙ্গ, ও কি

তোমারি করুণাবন্যা? ঐ যে পাহাড়ের বক্ষে নির্ঝরের মোহনমেলা, ও কি তোমারি স্তন্যপীযূষধারা? তাহা না হইলে এত সৌন্দর্য্য কার?

এখন বড় হইয়াছি। জীবনের বাল্যঅংশটুকু যৌবন হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তথাপি বাল্যের সকল সংস্কার যে একবারে মুছিয়া গিয়াছে তাহা বলা যায় না। বাল্যের এক একটি বাসনারেখা হৃদয়ের পর এরূপ ভাবে মুদ্রিত হইয়া আছে যে তাহা কোনো দিন বিলুপ্ত হইবে এমন কল্পনাও মনে উদয় হয় না; নানা দিক হইতে অজ্ঞাত অসংখ্য আকাঙ্ক্ষা ও আশঙ্কা আসিয়া জীবনকে যেমন কর্ম্মময় করিয়াছে, তেমন অশান্তিময় যে না করিয়াছে তাহাও নয়।

সে আজ অনেক দিনের কথা হইলেও, স্মৃতি-মন্দিরে সে কথা, সে দৃশ্য, সে আনন্দ-উল্লাস দরিদ্রের ধনরত্নরাজির ন্যায় যত্নে সঞ্চিত হইয়া আছে। বাল্যে যাহা অঙ্কুরিত হইয়াছিল, যৌবনে জননীর আশীর্ব্বাদের শান্তিবারিতে তাহা মুকুলিত হইল। যৌবনের প্রারম্ভে তেমনই একদিন সকালে, আমার বহুদিনের অভিলষিত-দর্শন দেওঘর যাত্রা করিলাম।

গাড়িতে আরোহণ করিয়া কি আনন্দ! কি এক অনির্ব্বচনীয় সুখ! তাহা যে সহজে কল্পনা করা যায় না। গাড়িতে উঠিয়া অবধি যেন কোনো কিছুই দেখিতে ভাল লাগিতেছিল না। তার পর বাঙ্গালার শ্যামল সমতল ক্ষেত্র হইতে যখন ক্রমে ক্রমে পর্ব্বতময় দেশের ভিতর দিয়া গাড়ি চলিতে লাগিল—যখন ছোট বড় পাহাড়গুলি মেঘ বলিয়া ভ্রম হইতেছিল, তখন যেন একটা আকাঙ্ক্ষা, একটা অনাস্বাদিত দর্শন-সুখের আনন্দবার্ত্তা বহিয়া আনিতেছিল। মনে হইতেছিল, কতক্ষণে সেই কল্পনায় গড়া, স্বপ্নে অঙ্কিত, শত সাজে সুসজ্জিত সুন্দর দেওঘরে

গিয়া উপস্থিত হইব; কতক্ষণে গিয়া নদীবক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িব, কতক্ষণে গিয়া পাহাড়ের চূড়ায় উঠিয়া দাঁড়াইব। আমার আশা শীঘ্রই পূর্ণ হইল। দেওঘরে উপস্থিত হইলাম। তখন প্রভাতের মৃদুমন্দ স্নিগ্ধ বাতাস আসিয়া যেন সাদরসম্ভাষণে অভ্যর্থনা করিল। পরিপূর্ণ প্রকৃতি যেন, তার সুষমাসম্ভারে সর্ব্বদিক্ হইতে আমাকে আচ্ছন্ন ও আকৃষ্ট করিয়া ফেলিল।

দেওঘর।—পথেই কয়জন পাণ্ডা আসিয়া সহসা ওয়ারেণ্টের আসামীর ন্যায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড খাতাপত্র লইয়া আমাকে গ্রেপ্তার করিল। পিতৃপুরুষের নাম ধাম—নানাবিধ ন্যায়, অন্যায় প্রশ্নে উদ্ভ্রান্ত করিয়া তুলিল। বন্যার অকস্মাৎ আগমনের ন্যায় আমার কল্পনা সেই শব্দবন্যায় ভাসিয়া যাইতেছিল। উপায়ান্তর না দেখিয়া নিমজ্জমান ব্যক্তির ন্যায় তাহাদের একজনকে অবলম্বন করিয়া বাবা বৈদ্যনাথের চরণপ্রান্তে আশ্রয় লইলাম। দেওঘর সম্বন্ধে অনেক বলিবার থাকিলেও সে সকল বহুবর্ণিত বর্ণনাগুলির পুনরুক্তি এ স্থলে নিষ্প্রয়োজন।

বৈদ্যনাথ দর্শন করিয়া, তাঁহার পূজা প্রদান করিয়া—নন্দন পাহাড়ে আরোহণ করিয়া ডিগোরিয়া দেখিয়া, নদী-সৈকতে বালুকার স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া যে কি এক আনন্দ অনুভব করিলাম তাহা বলিতে পারি না। মানুষ যতই কেন জ্ঞান, বুদ্ধি, বিজ্ঞতা, বয়স প্রাপ্ত হন না প্রকৃতির কোলে, শ্যামল তরুচ্ছায়ায়, সে যেন আনন্দদুলাল! শিশুর ন্যায় কোমল, মুক্ত! উদার! আমরা যে সময় দেওঘর গিয়াছিলাম সেই সময় গিধড়ের মহারাজা সপরিবারে দেবদর্শনে আগমন করিয়াছিলেন; দেওঘর তখন ভক্তের আনন্দকোলাহলে তরঙ্গায়িত হইতেছিল। দেওঘর হইতে গিধড় প্রায় ৩৪ মাইল দূর। কিন্তু, ভক্ত

রাজা সহস্র সুখসমৃদ্ধির সুশীতল ছায়ায় বর্দ্ধিত হইলেও শুনিলাম তিনি বৈদ্যনাথের আরাধনা করিতে গিধড় হইতে পদব্রজে আগমন করিয়াছেন। পাছে রেলে আসিলে পূজা-উপচার ম্লেচ্ছের সংস্পর্শে অপবিত্র হয়, পাছে তাঁহার উপাসনায় অশান্তি উপদ্রব উপস্থিত হয়, পাছে রাজ-ঐশ্বর্য্যের মোহ মনে অহঙ্কার আনয়ন করে, তাই তিনি সাধুর মত, সন্ন্যাসীর মত, পর্য্যটকের মত দেবপূজার সম্ভার নিজ স্কন্ধে বহিয়া আনিয়াছেন। এমন না হইলে ভক্তি, এমন না হইলে পূজা, এমন না হইলে কি আর হিন্দুরাজা!

হাঁসপাতালের সম্মুখেই আমরা বাসা লইয়াছিলাম। এই স্থানটি বেশ মনোরম। এইখান হইতে তিন দিকে তিনটি রাস্তা গিয়াছে। একটি দেওঘর ষ্টেশন অভিমুখে, অপরটি বৈদ্যনাথ জংসনের দিকে, অন্যটি 'নয়াডুমকারোড' বাবার মন্দির দিকে, সুতরাং সকল যাত্রীর গমনাগমন বাসায় বসিয়া বসিয়া বেশ দেখা যায়। সময় সময় অনেক পরিচিত মুখের সহিত অকস্মাৎ সাক্ষাৎ ঘটিয়া যাইত, তখন এক অনাস্বাদিত আনন্দের আবেগে হৃদয় ভরিয়া উঠিত। আবার যখন দেখিতাম, কোনো নবাগত পল্লীবাসী নবদম্পতির সম্মুখে পাণ্ডারা খাতাপত্র লইয়া বিষম গোল বাধাইয়াছে, আর পশ্চাতে সাত আটটি ভিক্ষুক বাজনদার তুমুল আন্দোলন করিয়া ঢোলে অবিচ্ছিন্ন ভাবে কাটী পিটিতেছে,—আর বলিতেছে, "তোর মত পুণ্যবতী সতী সাধ্বীর বড়ই পুণ্য, যে বাবা বৈদ্যনাথের দর্শন পেলি, দে মায়ি, একটা পয়সা দে।" আবার ও দিকে পাণ্ডারা ইতিহাসের পড়ার মত অনর্গল বংশ-লতার তালিকা আবৃত্তি করিয়া যাইতেছে, আর বলিতেছে,—"মিথ্যে বলিস্ নি, দেবতার স্থানে পাপ করিস্ নি, ভাল ক'রে মনে ক'রে দেখ্, আমি তোর পাণ্ডা কি না?" তখন সেই সব নবাগত যাত্রীর দশা

নিরীক্ষণ করিয়া যেমন দুঃখ হইত, তেমনি হাসিও পাইত—একটি পয়সার জন্য বাজনদারের অসীম অধ্যবসায়—বিপুল পরিশ্রম !

তপোবন।—এখানে থাকিতে থাকিতেই একদিন আমরা তপোবন দেখিতে যাত্রা করিলাম। কথিত আছে, সেখানে স্বয়ং ব্রহ্মা তপশ্চরণ করিয়াছিলেন। যে গোপ-নন্দনের নিকট আমরা দুধ লইতাম তাহার বাড়ী তপোবনের নিকটেই। কোনো কোনো দিন দুগ্ধ বিক্রয় করিয়া, সে আসিয়া আমাদের নিকট নানা গল্প বলিতে সুরু করিত; শেষে যখন বেলা বাড়িয়া উঠিত, তখন আর তার সেবেলা বাড়ী ফেরা সম্ভব হইত না। আমাদের সহিত মধ্যাহ্নের আহারটি সুসম্পন্ন করিত।

যাঁহারা তপোবন দর্শন করিতে যান, তাঁহাদের প্রাতঃকালেই গরুর গাড়িতে রন্ধন উপযোগী দ্রব্যাদির সংগ্রহ করিয়া বাহির হইতে হয়; কারণ ফিরিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া পড়ে। সেখানেই রন্ধনাদি করিয়া আহারাদি সম্পন্ন করিতে হয়।

সেই গোয়ালার ছেলেটিকে আমাদের পথিপ্রদর্শকের পদে অভিষেক করিয়া বেলা আন্দাজ দুইটার সময় আমরা তপোবন উদ্দেশে পদব্রজে যাত্রা করিলাম। এই গয়লার ছেলেটির নাম "বিন্দুয়া," বয়স ১৪।১৫ বৎসর। সহরের সংস্পর্শে আসিয়া ও বাঙ্গালী বাবুদের কৌতুক কথোপকথনে অংশীদার হওয়ায় তার গায়ে অনেকটা আধুনিক সভ্যতার হাওয়া লাগিয়াছে। সে বয়সাতিরিক্ত অভিজ্ঞ হইয়া পড়িয়াছে। দুনিয়ার অনেক কথা তাহার মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। তপোবন যাইবার পথটি বড়ই চিত্তাকর্ষক। দূরে ত্রিকূট পাহাড়, আকাশ পাহাড়ের উপর ঝুঁকিয়া কি পরামর্শ করিতেছে। মনে হইল আর অল্পদূর অগ্রসর হইলেই তাহার

নিকটবর্ত্তী হইব; কিন্তু যতই যাইতেছি ত্রিকূট যেন ততই সরিয়া যাইতেছে। আমরা আগ্রহ ও উৎসাহভরে খুব চলিতে লাগিলাম। আমাদের কথোপকথনে ও রসালাপে সেই বন্ধুর পথ যেন প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। অগ্রে অগ্রে গোপ-নন্দন চলিয়াছে; আমরা যেন অন্ধের মত, তাহার অনুসরণ করিতেছি,—"বিকুয়া" মাঝে মাঝে দাঁড়াইয়া পড়িতেছে, মুখ খুব গম্ভীর করিয়া বলিতেছে "এ পথ নয়, পথ ভুল হয়েছে; চলুন ফিরে যেতে হবে। তপোবনের রাস্তা পথে ফেলে এসেছি।" অগত্যা আমরা আবার ফিরিলাম। অল্পদূর আসিয়া সে হাসিয়া উঠিল—তার এই উচ্ছৃঙ্খল হাস্যধ্বনি বাতাসে কাঁপিতে কাঁপিতে দূর দুরান্তরে চলিয়া গেল। অবাক্ হইয়া তাহার দিকে তাকাইলাম। সে কহিল,—"না,ঐ রাস্তাই ঠিক," তার এই আচরণে যেমন রাগিয়া উঠিলাম, সে ছুটিয়া একটা উচ্চ পাষাণস্তূপের উর্দ্ধে উঠিয়া হাসিতে আরম্ভ করিল; বলিল,—"আমি পথ জানি না, যেতে পারব না।" তখন সেই দুরন্ত বালকটিকে অনুনয় বিনয় করিয়া বকৃশিসের মাত্রা সম্ভবাতিরিক্ত বৃদ্ধি করিয়া বশ্যতা স্বীকার করান হইল। এইবার কৌশলে তাহাকে দলের মাঝখানে সন্নিবেশিত করা হইল। উপেনবাবু সর্ব্বাগ্রে চলিলেন, পশ্চাতে রহিলেন সুবোধবাবু—পাছে সে পুনরায় পলায়। দুই ঘণ্টা পথ চলিয়া আমরা শ্রান্ত হইয়া পড়িলাম। রাস্তাটি উঁচু নীচু, মাঝে মাঝে বড় ঢিপির মত অনেকগুলি পাহাড় অতিক্রম করিতে হইল। কোথাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝরণাগুলি রৌদ্রকিরণে রূপার পাতের মত চক্‌মক্ করিতেছে। সেইগুলির নিকট উপস্থিত হইলেই অঞ্জলি ভরিয়া স্নিগ্ধ বারি সেবন করা হইতেছিল।

এইবার যে স্থানটায় আসিয়া পৌঁছিলাম সেখানটা বড়ই মনোরম—পথের মাঝে একটি ক্ষুদ্র পাহাড় এবং সেই পাহাড়ের মধ্যে পর্ণকুটি

ক্রমে ক্রমে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, পথ নির্ণয় করা একরূপ অসম্ভব। এই পাহাড়টি একেবারে মরুময়—একটিমাত্র বৃক্ষলতা পরিদৃষ্ট হয় না; রৌদ্রদগ্ধ নির্ম্মম কঠিন পাষাণস্তূপ যেন পথিককে পরিহাসচ্ছলে পথ ভুলাইবার নিমিত্ত পড়িয়া আছে। তাহার উপর উঠিলে অনেকদূর পর্য্যন্ত দেখা যায়—দেওঘরের বড় বড় বাড়ীগুলি যেন মনে হয় ভূ-কম্পনে মৃত্তিকার গর্ত্তে বসিয়া গিয়াছে। এই স্থানটির নাম বিকুয়া বলিল "চরকি-পাহাড়ী"। আমাদের মনে হইল এখানে আসিয়া যেরূপ পথ খুঁজিতে হয়, তাহাতে ইহার নামকরণে অনুমাত্র অন্যায় হয় নাই। চরকি-পাহাড়ীর উপর আসিয়া বিকুয়া ব্যাটা যেন চরকীর মত ঘুরিতে লাগিল। তাহার স্ফূর্ত্তি দেখিয়া ত হাসিয়া বাঁচি না। চতুর্দ্দিকে অনন্ত বিস্তৃত শ্যামলশস্যক্ষেত্র, মাঝে মাঝে দুই একখানি অতি ক্ষুদ্র কুটীর, দুই একটি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তালবৃক্ষ। সেগুলি যেন চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। অদূরে ত্রিকূট মাথা উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইয়া। তাহারই দক্ষিণে তরুচ্ছায়াশ্যামল তপোবনের কমনীয় দৃশ্যাবলী অল্প অল্প নয়নগোচর হইতে লাগিল। সে দৃশ্যে প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিতেছিল। এই সময় বিকুয়া বলিল,—"বাবু, ঐ তপোবন! আপনারা এই রাস্তা ধরে বরাবর যান, তা হ'লেই তপোবনে গিয়া উঠ্‌বেন।" তার দুষ্টামি বুঝিতে বড় বেশীক্ষণ লাগিল না, সে আরও কিছু পয়সা বেশী চায়। আমরা বলিলাম,—"যদি তুই তপোবন পর্য্যন্ত যাস্ তবে তোকে আর দু-আনা বেশী দিব, নতুবা এক পয়সা পাবি না।"

তখন পশ্চিম দিগন্তে দিনদেব সুবর্ণ তরঙ্গোচ্ছ্বাসে অবগাহন করিতেছেন। শৈলশিখরের উপর অস্তমিত সূর্য্যকিরণে প্রকৃতির মিলন হাসির ক্ষীণোজ্জ্বল রক্তিম আভাটুকু, ঘুমন্ত শিশুর হাসির মত, বড় স্নিগ্ধ ও পবিত্র দেখাইতেছিল—দূর হইতে মুক্ত প্রান্তরের বক্ষে নির্ম্মল অনিল

প্রবাহিত হইয়া আসিতেছিল। শীঘ্র সন্ধ্যা হইবে ভাবিয়া আমরা খুব তাড়াতাড়ি করিতে লাগিলাম। উপেন্‌বাবু রাগিয়া বিকুয়াকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন। তখন সে আবার শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। যখন তপোবনের খুব নিকটবর্ত্তী হইলাম, তখন বিকুয়াকে বলা হইল,—"কই, তোর বাড়ী কই?" সে প্রথমে কোনো মতে তার বাড়ী দেখাইতে স্বীকৃত হইল না, অবশেষে অনেক ভয়প্রদর্শন ও পীড়াপীড়ির পরে একটি বড় মৌউল বৃক্ষের নিম্নে তালপাতা সমাচ্ছাদিত একখানি পর্ণকুটীর দেখাইয়া বলিল,—"ঐ আমাদের বাড়ী"। কুটীরের চতুর্দ্দিকে কাঁটাগাছের বেড়া, উঠানের এক পার্শ্বে একটি আতা গাছ। অন্য দিকে দুইটি বড় বড় পেঁপে গাছ, তাহাতে পত্র অপেক্ষা ফল ও ফুলের সংখ্যা বেশী। আমরা সদলে তাহাদের সঙ্কীর্ণ প্রাঙ্গনে গিয়া অতিথি হইলাম। অকস্মাৎ বিকুয়ার যেন অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ঘটিল,—সে বলিল, "মা, বাবুরা এসেছেন, তপোবন দেখ্‌বেন।" তারপর যাহা কিছু কর্ত্তব্য সব যেন তার মা জানে। সে কেমন করিয়া আমাদের অভ্যর্থনা করিবে, কেমন করিয়া বা কোথায় আমাদের বসাইবে, এমনতর তাহাদের আর কখনও হয় নাই। তাহাদের ক্ষুদ্র কুটীরপ্রাঙ্গন ত এত ভদ্রলোকের সমাগমে কোনদিন মুখরিত হয় নাই। তাহাদের কুটীরখানি, উঠানে বাঁধা দুইটি ছাগল, তাহার বৃদ্ধ পিতা—সব যেন স্তব্ধ ও নির্ব্বাক্ হইয়া গেল। পাশের ঘর হইতে কাহার যন্ত্রণাকাতরধ্বনি মৃদু মৃদু শ্রুত হইতেছিল। বিকুয়ার পিতা অত্যন্ত বৃদ্ধ। বুড়া যেন সংসারের দারুণ নিষ্পীড়নে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, এখন আর দুধ লইয়া দেওঘর যাইতে পারে না। বিকুয়াই তাহাদের একমাত্র অন্ধের-যষ্টি, তাহাকে দেওঘরে পাঠাইয়া এই বুড়াবুড়ী একদৃষ্টে পথপানে তাকাইয়া

থাকে। বিকুয়ার জননী পাশের ঘর হইতে একখানি 'চেটাই' টানিয়া বাহির করিলেন। মনে হইল এই দরিদ্র-সংসারে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ বা উৎকৃষ্ট ছিল, তাহাই আজ আমাদের অভ্যর্থনার জন্য বাহির হইল। সে খানি বিশেষ ব্যবহৃত বলিয়া অনুমিত হইল না। ঘরের দাওয়া অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। সুতরাং সেই আতাবৃক্ষের পাদদেশে চেটাইখানি বিস্তৃত করা হইল। আমরা আগ্রহ ও উৎসাহ প্রকাশ করিয়া তাহার উপর উপবেশন করিলাম।

যেন পুণ্যাশ্রমের পবিত্র প্রাঙ্গনে আজ আমরা সমবেত হইয়াছি। বৃদ্ধ আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার দৃষ্টি যেন বলিতে-ছিল,—"আদেশ করুন, কি করিয়া আপনাদের তৃপ্তিসাধন করিতে পারি।" বিকুয়ার সকল চাঞ্চল্য তখন সংযত; সে চেটাইয়ের একপার্শ্বে গিয়া বসিয়া আছে। বৃদ্ধা যেন, কি বলিবেন বলিবেন, মনে করিয়া বলিতে পারিতেছেন না। তিনি একবার স্বামীর মুখের প্রতি, একবার পুত্রের আননের দিকে কাতরদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে-ছেন। তাঁহার মুখের উপর বেশ একটি আনন্দরাগ বিরাজ করিতেছে। এই সময় উপেন্‌বাবুর দৃষ্টি একটী অর্দ্ধনগ্ন বালকের প্রতি পতিত হইল। তিনি তাহাকে সাদরে নিকটে আহ্বান করিলেন। বালক ভয়চকিতদৃষ্টিতে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়াবস্থায় মস্তক নত করিয়া দূরে দাঁড়াইয়া রহিল, একপদও অগ্রসর হইল না। তখন বিকুয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল,—"ও আমার ছোট ভাই, ভৈঁায়িস্ চরাতে গিয়াছিল।" তার পর ছুটিয়া গিয়া ভ্রাতার হস্ত ধারণ করিয়া গৃহের দিকে টানিয়া আনিতে লাগিল ও তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিল,—"ওঁরা বাবু, ভয় নেই আয়।" উপেন্ বাবু তখন উঠিয়া গিয়া বালকের গাত্রে ও মস্তকে হাত বুলাইয়া আদর করিলেন।

বালক বলিল,—"ভেঁায়িস ও গাই ঐ গাছতলায় রেখে এসেছি।" বালকের বয়স নয় বৎসরের অধিক নয়। কিন্তু তার হাতে একগাছি চার হাত লম্বা লাঠি, পরিধানে কৌপীন। তাহারই তত্ত্বাবধানে তিনটি মহিষ ও দুইটি গরু। এইবার সে অনেকটা সাহস পাইল। গরু মহিষ গোয়ালে তুলিল। তাহার কার্য্য ও শক্তি দেখিয়া আমরা অবাক্ হইয়া গেলাম। দূর হইতে আর অনেকগুলি বালকবালিকা সকৌতুকদৃষ্টিতে আমাদের কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিতেছিল। তাহাদের দিকে চাহিবামাত্র তাহারা ছুটিয়া পলায়ন করিতেছিল। পথ হাঁটিয়া অত্যন্ত পিপাসা বোধ হইয়াছিল। জল চাইতেই যেন গৃহস্বামিনী বড়ই বিব্রত ও অধীর হইয়া পড়িলেন। এমন পাত্র নাই—যাহাতে করিয়া জল দিতে পারেন। এই সময় পার্শ্বের ঘর হইতে তাঁহার কন্যা কাঁপিতে কাঁপিতে বাহিরে আসিল। অনুসন্ধানে জানিলাম সে আজ চার পাঁচ দিন জ্বরে ভুগিতেছে। কিন্তু তাহাদের মতে ভূতের হাওয়া লাগিয়াছে,— "ঝাড়্ ফুঁক্" চলিতেছে। কিন্তু দুরন্ত ভূত কোন মতেই বেচারীর সংসর্গ ত্যাগ করিতেছে না। আমরা মেয়েটিকে অচিরে ডাক্তার দেখাইতে অনুরোধ করিলাম। বৃদ্ধের ম্লান অধরপ্রান্তে ক্ষীণ হাসির রেখা দেখা দিল। তিনি বলিলেন,—"মন্তোরে সেরে যাবে বাবু, আমরা কখন দাওয়াই খাই না।" এই অবসরে বৃদ্ধা বলিলেন,—"আমাদের ঘরের জল আপনাদের দিতে ভয় হয়, এ ত নদীর জল নয়। দুধ দেব কি?"

উপেন্ বাবু বলিলেন,—"দুধ পেলে কি আর জল চাই।" তখন বৃদ্ধা একটা বড় কেঁড়ে পরিপূর্ণ দুধ বাহির করিলেন, প্রায় পাঁচ সের দুধ; ঢালিয়া ঢালিয়া দিতে লাগিলেন; আমরা আনন্দে দুধ খাইলাম। সেই তরুচ্ছায়স্নিগ্ধ—সেই নীরব নিস্তব্ধ প্রান্তরের মধ্যে ক্ষুদ্র কুটীর আজও আমাদের স্মৃতিতে উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। অদূরে বিকুয়া, পার্শ্বে তার

ছোট ভাই, জ্বরক্লিষ্টা ভগিনী, বৃদ্ধ পিতা নির্ণিমেষ নয়নে আমাদের প্রতি তাকাইয়া; সেই চাহনি হইতে এমন একটি মধুর ভাব প্রকাশ পাইতেছিল, যে তাহারা আজ যেন এমন একটি কাজের অনুষ্ঠান করিবার অবসর লাভ করিয়াছে, তাহা বুঝি তাহারা কোনও দিন স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারে নাই। বৃন্দাবনের গোপগৃহের সকল সৌন্দর্য্যে আজ বৈদ্যনাথের কঙ্করময় ও বন্ধুর পথ, প্রান্তর এবং দীনদরিদ্রের পর্ণকুটীর, ভরিয়া উঠিল। উল্লাসে নয়নে জল আসিল। আমরা দুধের দাম দিতে উদ্যত হইলে, বিকুয়ার মা জিব্ কাটিয়া সঙ্কুচিত হইয়া অত্যন্ত বিনয় করিয়া বলিলেন,—"বাবু, মাপ্ করুন; আমরা গরীব সত্য, কিন্তু অতিথিসেবা করা আমাদের ধর্ম্ম।" তার পর জননীর স্নেহে পরিপূর্ণ হইয়া বলিলেন,—"এই বেলা বিকুয়া, বাবুদের নিয়ে যা; নয় ত অন্ধকার হ'য়ে এল বড় কষ্ট হবে, বাঘের ভয় আছে।" ছোট ছেলেটি এতক্ষণ বড় কথা কয় নাই, সে তার বড় যষ্টিগাছি নাড়িয়া বলিল,—"মায়ি আমি যাব, ভয় কি ?"

বিকুয়াদের বাড়ী হইতে তপোবন পনের মিনিটের পথ। সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বেই আমরা তপোবনে উপস্থিত হইলাম। পাহাড়ের উপর একটি সুন্দর মন্দির—অনেকগুলি সোপান অতিক্রম করিয়া মন্দিরে উঠিতে হয়। নিম্নে একটি প্রকাণ্ড রকমের মঠ; সেখানে অনেকগুলি সাধুবেশী লোক গঞ্জিকা প্রস্তুতে বিব্রত। কেহ কেহ মনকে নরম করিবার জন্য বোধ হয় রুটীর আটার উপর দিয়া কসরৎ করিতেছে। বড় বড় আটার তালগুলিকে এমন ভাবে পেষণ করিতেছে যে, কপাল হইতে অজস্র স্বেদনির্গম হইতেছে। মাঝে মাঝে টিপিয়া দেখিতেছে কতটা নরম হইল। তাহারা আমাদিগকে ঠাকুরের পূজা দিতে বার বার অনুরোধ করিতে লাগিল। গৃহে বসিয়া এমন শিকার খুব কম জোটে।

উপরে গিয়া একটি চাতালের উপর উপবেশন করিলাম। সেই চাতালের সম্মুখেই মন্দির; তখন ভিতর হইতে মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ। অনেক ডাকাডাকির পর দ্বারমুক্ত করিয়া একজন গৈরিকবসনধারী সন্ন্যাসী বাহির হইলেন। আমরা সকলে তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। তিনি আগ্রহভরে আমাদের বসিতে অনুরোধ করিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে তাঁহার সহিত বেশ আলাপ পরিচয় হইল। তিনি আমাদিগকে মন্দির অভ্যন্তরে লইয়া গেলেন। মন্দিরের মধ্যে একটী বেদী, বেদীর উপর একখানি সিংহাসন, সিংহাসনের উপর একখানি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, একখানি জীর্ণ গৈরিকবসন, এক জোড়া খড়ম রহিয়াছে। তাহার উপর ফুলচন্দন দিয়া পূজা হইয়াছে। আশ্রমটির মধ্যে গিয়া বেশ একটি অনাবিল ভক্তির স্রোতে হৃদয় আপ্লুত হইয়া উঠিল। গৃহের মধ্যস্থলে একটি গহ্বর; উহার উপর হইতে কবাট বন্ধ রহিয়াছে। অনুসন্ধানে অবগত হইলাম, ঐটিই "ব্রহ্মার গুহা" ঐখানে তিনি তপস্যা করিতেন। স্বামীজির আসন ঐখানে বিদ্যমান আছে। গুহার অভ্যন্তরটি দেখিবার নিমিত্ত আমাদের কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। মনের আকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে জ্ঞাপন করিলে তিনি বলিলেন, "আপনারা কষ্ট স্বীকার করিয়া নীচে যাইতে পারিবেন কি? প্রথমটা কিন্তু অত্যন্ত অন্ধকার, কোথাও পাথর উঁচুনীচু হইয়া আছে।" আমরা সম্মতি জ্ঞাপন করিলে, তিনি উপর হইতে কবাট উন্মোচন করিলেন। তখন গাঢ় জমাট অন্ধকারময় গুহা দৃষ্টিপথে পতিত হইল। একটি দেয়াশলাই জ্বালাইয়া তিনি গুহার পথটি আমাদের দেখাইয়া দিলেন। ভিতরে যাইবার খুব ছোট ছোট চার পাঁচটি সিঁড়ি আছে। তাহার ভিতরে আর একটি গুহা। সেই স্থানে প্রবেশ করিতে হইলে অগ্রে পা দুইটি প্রবেশ করাইয়া পরে পৃষ্ঠে ভর দিয়া

শুইয়া শুইয়া ধীরে ধীরে যাইতে হয়। এই প্রকার উপায়েই তিনি ভিতরে প্রবেশ করিলেন। তারপর আমাদের আহ্বান করিলেন বলিলেন, "ভয় নাই, আসুন" ভিতর হইতে তাঁহার স্বর যেন গম্ গম্ করিতে লাগিল। ধীরে ধীরে সকলেই গুহাভ্যন্তরে অবতরণ করিলাম। গহ্বরাভ্যন্তর অপূর্ব্ব, বিস্তৃত,—কুড়িজন লোক একত্র অনায়াসে উপবেশন করিতে পারে। মস্তকের উপর পর্ব্বত, পদতলে পর্ব্বত, চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতপ্রাচীর বেষ্টিত। এইরূপ স্থানে আর কখন আসি নাই। প্রথমটা অন্ধকারে কেহ কাহাকেও দেখিতে পাই নাই। অল্পক্ষণের মধ্যেই যেন অন্ধকার তরল হইয়া আসিল। একটু একটু আলো ফুটিয়া উঠিল। তখন স্পষ্ট দেখা গেল গুহার একপার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র বেদীর উপর একখানি মৃগচর্ম্ম, মৃগচর্ম্মের উপর একখানি শার্দ্দূল চর্ম্মে সাধকের আসন সন্নিবেশিত রহিয়াছে। এমন নির্জ্জন না হইলে কি সাধনার স্থান!

যেন গুহামধ্যে অতীতযুগের হোমধূম গন্ধ, পুষ্প চন্দন ধূপের মনোমোহকর, সৌরভ এখনো ভরিয়া রহিয়াছে। বাহিরের কোনো শব্দ সেখানে প্রবেশ করে না। মানব শান্তি অন্বেষী হইয়া, শত সুখ সৌন্দর্য্য বিলাস বিভ্রম পরিত্যাগ করিয়া যে স্থানে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহা যে কত সুন্দর, কত মনোহর, কত তৃপ্তিদায়ক, আজ এই গুহাভ্যন্তরে আসিয়া তাহা উপলব্ধ করিলাম। যাঁহাদিগকে আমরা অরণ্যবাসী, গুহাবাসী বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকি, তাঁহাদের এই আনন্দ-আবাসস্থান দেখিয়া সে ভ্রম অচিরে বিদূরিত হইল। সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময় আমরা তপোবন হইতে আনন্দপূরিত অন্তরে বিদায় গ্রহণ করিলাম। সে আজ কতদিন হইয়া গেল, তথাপি তাহার কথা ভুলিতে পারি নাই।

এটোয়া।

সে দিন বেশ মনে আছে—কন্‌সেসনের শেষ দিন। ষ্টেশনে অত্যন্ত ভিড়। বহুকষ্টে একখানি টিকিট কিনিয়া বিস্তর ঠেলাঠেলি ও উমেদারীর-পর পাঞ্জাবমেলে একটু স্থান সংগ্রহ করিলাম। ভাঙ্গা বাড়ীর 'ঠেকার' মত আরোহীরা চারিদিক হইতে যেন চাপিয়া রহিল। নড়িবার চড়িবার উপায় নাই। নিঃশ্বাস ফেলিতে কষ্ট হইতেছিল; তথাপি মনে একটা অভূতপূর্ব্ব আনন্দ লহর খেলিতেছিল। বর্দ্ধমান অতিক্রম করিলেই ভিড় অল্প কমিয়া আসিল। একটু বসিবার মত স্থান পাইলাম। বৈদ্যনাথেও অনেক যাত্রী অবতরণ করিল। তখন বসিতে পাইয়াছি সুতরাং শয়নের চেষ্টা হইল। কিন্তু বড় সুবিধা হইল না। বসিয়া বসিয়া ঢুলিতে লাগিলাম। বাষ্পীয়যান সুখ দুঃখের অতীত—অন্যের সুখ, দুঃখ, বেদনা সে কেমন করিয়া বুঝিবে—সে কেবল জানে মাঝে মাঝে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইতে, তারপর বিষম চীৎকার করিয়া ছুটিয়া যাইতে।

কত দেশ, কত জনপদ, কত নদী, কত তীর্থ পশ্চাতে ফেলিয়া গাড়ি উদ্দাম গতিতে ছুটিয়াছে—তার রাত্রি দিন উভয়ই সমান—আলো-অন্ধকার তুল্য—ছায়া রৌদ্র একই! গাড়ি যত ছোটে—মন তত আনন্দে উধাও হইয়া উঠে। অজ্ঞাত দেশ দেখিবার কেমন যে একটা উদ্দাম উল্লাস—অধীর ব্যাকুলতা; তাহার তুলনায় দ্রুত গমনশীল মেলের গতিকেও মৃদু ও মন্থর বলিয়া অনুমিত হইল।

যাঁহারা আগরা ছাড়াইয়া গিয়াছেন তাঁহারা "এটোয়া" নামক রেলওয়ে ষ্টেশনটি পথে ফেলিয়া গিয়াছেন। এটোয়ায় কোনরূপ প্রসিদ্ধ তীর্থ বা দেবদেবীর মন্দির নাই বলিয়া তাহার প্রতি কাহারও বড় একটা দৃষ্টি পড়ে না। সেই একঘেয়ে অপরিহার্য্য জনার ও ভুট্টা মিশ্রিত আটার 'পুরি' ভিন্ন এখানে রসনার তৃপ্তিকর কিছু আহার্য্য পাওয়া যায় না। অন্নগতপ্রাণ বাঙ্গালীর পক্ষে দুই তিন দিন ক্রমাগত 'পুরির' উপর নির্ভর করিয়া থাকা বড় কষ্টকর। সে অভিজ্ঞতা যাঁহার নাই, তাঁহাকে সে কষ্ট বোঝান সুকঠিন। রেলওয়ে ষ্টেশনে গাড়ি আসিয়া থামিয়াছে, তুমি সবেমাত্র মুখ বাহির করিয়া কোন পরিচিত মুখ দেখিবার আশায় এদিক ওদিক চাহিতেছ, অমনি মিঠাইওয়ালা তোমার কাণের কাছে হাঁকিয়া গেল—"বাবু, পুরি মিঠাই।" কেবলই সেই, পুরি—কি ভয়ানক! অদৃষ্টের দুঃখের মত, ক্ষতের জ্বালার মত, অভিশাপ বার্ত্তার মত, পশ্চিমের সারা পথে 'পুরি' সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে। 'পুরি' এই শব্দ শুনিলেই একটা আতঙ্ক মনের মধ্যে জাগিয়া উঠে। তখনকার দিনে পাঞ্জাব-মেল বা ডাক গাড়ির সাধারণতঃ এটোয়া পৌঁছিতে রাত্রি ৮টা বাজিত। এই সকল কারণে দূর তীর্থযাত্রী বা অন্য কোন আরোহীর গাড়ি হইতে নামিবার বড় একটা সুবিধা বা ইচ্ছা হয় না। সুতরাং এটোয়া একটী বড় ষ্টেশন হইলেও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে না। কিন্তু এটোয়ায় পৃথ্বিরাজের দুর্গ ছিল বা তাহার ভগ্নাবশেষ এখনও আছে, বোধ হয় অনেকেই ইহার খবর রাখেন না। এই দুর্গটী প্রায় সম্পূর্ণরূপে মাটির নির্ম্মিত। মাটির দুর্গ, সহজেই সকলের মনে আজি-কালিকার দিনে একটী হাস্যরসের অবতারণা করে তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রথমেই বলিয়া রাখিতেছি,

যে বর্ণিতদুর্গ মৃত্তিকাগঠিত হইলেও প্রচণ্ড পাঠান-বাহিনীর আক্রমণ হইতে পুনঃ পুনঃ আত্মরক্ষা করিয়া আজও সে মরিয়া বাঁচিয়া আছে। এটোয়া আজও তাহার উজ্জ্বল গরিমা-গাথা সগর্ব্বে জন-সমাজে ঘোষণা করিতেছে। পশ্চিমের নানাস্থানে বিপুল শক্তিশালী দুর্গসকল এখনও অতীতগৌরবের চিহ্নস্বরূপ বিদ্যমান আছে। দিল্লী, আজমীর, জয়পুর, চিতোর, উদয়পুর প্রভৃতির দুর্গ সকল অনেকেই দেখিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস যে, এটোয়ার দুর্গটী তাহাদের অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নয়।

এটোয়া কলিকাতা হইতে ৭২০ মাইল দুরে অবস্থিত। বর্ত্তমান রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে সহরটী প্রায় দেড় মাইল দুরে। এই ষ্টেশনে নামিয়া উটের গাড়িতে করিয়া অনেকেই মৈণপুরী, ফরক্কাবাদ, আগরা, গোয়ালিয়র, প্রভৃতি স্থানে যাইয়া থাকেন। রেলওয়ের সুবিধা সত্ত্বেও উটের গাড়ির বহুল প্রচলন এখনও দেখা যায়। এটোয়া ষ্টেশন হইতে একটী সুন্দর রাস্তা সহরের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে। রাস্তাটির দুই পার্শ্বে সম-উচ্চ নিম্ব-বৃক্ষ-শ্রেণী ছায়া বিস্তার করিয়া রাস্তাটিকে আরও মনোরম করিয়া তুলিয়াছে। এই রাস্তার উপর একটী বেশ বড় রকম ধর্ম্মশালা আছে। এ সকল অঞ্চলে নিম্ববৃক্ষের প্রাধান্য বড় বেশী, এমন কি এখানকার অনেক বাটীর দরজা-জানালা নিম কাঠে প্রস্তুত। প্রাতঃকালে যখন এই সকল বৃক্ষ মৃদু পবনে হিল্লোলিত হইতে থাকে, তখন প্রাণ একটা অপূর্ব্ব আনন্দে ভরিয়া যায়; শরীরে নববলের সঞ্চার হয়, নির্ম্মল বায়ুর প্রাণময়ী শক্তি প্রতি শিরায় অনুভব করা যায়।

এটোয়া সম্বন্ধে আর দুই চারিটী কথা না বলিলে এটোয়ার

আতিথ্যের প্রতি আমার অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ হয়। যে কয়দিন এটোয়ায় কাটাইয়া আসিয়াছি, সেই কয়দিন তাহার জলবায়ু আমার ভগ্ন-স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতিসাধন করিয়াছিল, তাহা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব। অনেকে বলেন—এখানকার জল বাঙ্গালার দুধ অপেক্ষা উত্তম ও উপাদেয়—সে কথা বর্ণে বর্ণে সত্য।

আজকাল বাঙ্গালী চাকুরীর জন্য, স্বাস্থ্যের জন্য, ভ্রমণের জন্য গৃহের আঙ্গিনা ছাড়িয়া প্রবাসে যাইতে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হইয়া পড়িতেছে,—এটা বড় আশা ও সুখের কথা! এই উপলক্ষে ভূগোলবর্ণিত ভারতের ঐতিহাসিক অভিনয়-ক্ষেত্রে বাঙ্গালী আপনাকে দেখিয়া যে বিপুল আনন্দ অনুভব করে, তাহার গভীরতা, তাহার প্রাণারামতা, নিজে বুঝিয়া ও দেখিয়া আসিয়াছি। আপনার গৃহে আপনি পর হইয়া থাকিলে সে গৃহের সুখশান্তি যেমন প্রীতিকর হয় না, সেইরূপ আপনার দেশের গৌরব-কীর্ত্তি পরের মুখে শুনিলে বা অপরের দৃষ্টিতে দেখিলে তাহা হৃদয়ের সহিত অনুভব করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে।

আমাদের বর্ণনীয় এটোয়ার দুর্গ প্রাচীন ইতিহাসের সহিত বিজড়িত। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে এটোয়া হিন্দুর অধিকারভুক্ত ছিল, বহুদিন ধরিয়া এই সৌন্দর্য্যশালিনী নগরী তাহার সুখ-সৌন্দর্য্য হিন্দুর সেবায় নিযুক্ত করিয়া, স্বীয় গৌরবকাহিনীতে নানা দেশের রাজন্যবর্গের কর্ণকুহর পরিপূরিত করিয়াছিল। এই পুরাতন এটোয়ার গৌরবস্মৃতি এখন অন্ধকারগর্ভে নিমজ্জিত।

নগরের কণ্ঠ-বেষ্টন করিয়া, কলনাদিনী কালিন্দী ধীরে প্রবাহিত। ষ্টেশন হইতে যমুনা দুই মাইল মাত্র দূর। এই যমুনার গর্ভ হইতেই পৃথ্বীরাজের দুর্গ উত্থিত হইয়াছে। দুর্গের পাদমূল হইতে

যমুনা এখন কিছু দূর সরিয়া গিয়াছে। যমুনার স্নেহবিচ্যুত হইয়া দুর্গটি যেন দুঃখে আপনাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ভগ্নস্তূপে পরিণত করিয়া পড়িয়া আছে।

যখন শুনিলাম পৃথ্বীরাজের দুর্গ এইখানে, এবং এই ভগ্নস্তূপই একটা অতীতগৌরবের স্মৃতির সহিত সংলগ্ন, যখন জানিলাম এই অভেদ্য দুর্গ শত সহস্র বার যবন-আক্রমণ ব্যর্থ করিয়াছে, তখন তাহার নববিকশিত সৌন্দর্য্য-প্রভায় আমার আনন্দ-বিস্ফারিত নয়ন মুগ্ধ হইয়া পড়িল। অনেক অতীত-কাহিনী যেন সজীব হইয়া নয়ন সম্মুখে প্রতিফলিত হইয়া উঠিল। ভাবিলাম, আমাদের ইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞান কত কম।

এতদুর আসিয়া কেবল দুগ্ধ, ঘি, জল বায়ু লইয়া বিব্রত হইয়া রহিলাম; যে দেশে আসিয়াছি, সে দেশের কোন সংবাদ লইলাম না। পরদিন এটোয়া সহর দেখিতে বহির্গত হইলাম। এখানে অনেকগুলি ছোট বড় বাজার আছে। একটী হাঁসপাতাল, আদালত ও স্কুল আছে। বুঝিলাম, এখানে নানাজাতীয় বণিকেরা বেশ রীতিমত কারবার করিয়া থাকেন। দেখিলাম, সহরের রাস্তার দুই ধারে বড় বড় কারবারীর দোকান। দোকানে নানা দেশ হইতে পাইকারগণ আসিয়া খরিদ বিক্রয় করিয়া থাকেন। অনেকে অবশ্য জানেন যে, এটোয়ার ঘি খুব প্রসিদ্ধ; এখানে ঘি, তুলা সতরঞ্চ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় এবং ঐ সকল দ্রব্য নানা স্থানে রপ্তানি হইয়া বহুমূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। এখানে বাঙ্গালী নাই বলিলে চলে। একজন মাত্র বাঙ্গালীর সহিত আমার দেখা হইয়াছিল। শুনিলাম, তিনি সিমলা-শৈলে কর্ম্ম করেন, বাড়ী হুগলি জেলায়, ম্যালেরিয়ার ভয়ে বড় একটা দেশে যান না। ছুটি লইয়া বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য

এখানে আসিয়াছেন, প্রতি বৎসরই নাকি তিনি এমনি সময় আসিয়া থাকেন। তিনি এখন ষ্টেশনের নিকট একটী ধর্ম্মশালায় বাস করিতেছেন।

একদিন বৃদ্ধ চাকর রামসিংকে ডাকিয়া নিকটে বসিতে আদেশ করিলাম; তাহাকে এটোয়া সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করিলাম। রামসিং আমার এটোয়ায় নিয়োজিত চাকর। বৃদ্ধ কয়দিন বেশ যত্ন করিয়া আমার কাজকর্ম্ম করিতেছে। সে আমার অবসরের সঙ্গী। যখন পুস্তকাদি পাঠে তৃপ্তি অনুভব করিতাম না, তখন রামসিংএর আশ্রয় ভিন্ন আমার গতি ছিল না। রামসিংএর নিকট এটোয়া সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনিতাম। আহা বেচারি কেমন দুলিয়া দুলিয়া সুর করিয়া গল্প বলিত। বলিতে বলিতে যেন তাহার শরীরের মধ্যে পুলক-সঞ্চার হইত। যুদ্ধের কথা বলিতে গিয়া সে খুব উত্তেজিত হইয়া উঠিত। দন্তহীন মুখ হইতে কথাগুলি এত তাড়াতাড়ি উচ্চারিত হইত যে, আমি সবগুলি স্পষ্ট বুঝিতে পারিতাম না। একদিন তাহাকে বলিলাম, "চল, রামসিং, আমরা যমুনায় স্নান করিয়া পৃথ্বীরাজের অভেদ্য দুর্গ দেখিয়া জীবন সার্থক করিয়া আসি।" রামসিং দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল "বাবু, আপনি দিল্লী আগরা হইয়া আসিতেছেন, মোগল-পাঠানের সুদৃঢ় ও সুগঠিত প্রস্তর-নির্ম্মিত সে সকল দুর্গের তুলনায় কি এই ভগ্নদুর্গ দেখিতে ভাল লাগিবে? এই দুর্গের এখন আর পূর্ব্বের সুখসম্পদ্ কিছুই নাই। তবে শত শত বর্ষা ও সহস্র ঝঞ্ঝা মস্তকে বহিয়া এখনও যে সে দাঁড়াইয়া আছে ইহাই বিচিত্র।" বৃদ্ধ এই দুর্গসংশ্লিষ্ট কিংবদন্তীর অবতারণা করিবার এ অবসর ছাড়িল না। সে আরও বলিল, 'শুনিয়াছি, মুসলমানেরা শত সহস্রবার এই দুর্গ আক্রমণ

করিয়াছিল, তথাপি ভগ্ন করিতে সমর্থ হয় নাই।' মাটির কেল্লার এত গৌরববিভব শুনিয়া বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। পৃথ্বীরাজের নামের সহিত এই দুর্গের নাম সংলগ্ন থাকায় একটী অপূর্ব্ব প্রীতিস্পর্দ্ধায় আমার হৃদয় ফুলিয়া উঠিল। অশিক্ষিত রামসিং, বাঙ্গালীর দাসত্বে নিয়োজিত রামসিং, সেও তাহার দেশের ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক গল্প ও কাহিনী কেমন সংগ্রহ করে! আর আমরা এত অর্থব্যয় করিয়া এতদূর আসিয়া কেবল ভগ্নস্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার চেষ্টায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ি।

এখানে এটোয়া সংক্রান্ত আরো দুই চারিটি কথার উল্লেখ করিব। এখানকার রাস্তাগুলি ঠিক "সুইচ্ ব্যাক রেলওয়ের" মত, কোথাও খুব উচ্চে উঠিতে হয়, কোথাও বা অত্যন্ত নিম্নে নামিয়া যাইতে হয়। নিম্নে অসমতল ক্ষেত্রের উপর ছোট-বড় বাড়ীগুলি চিত্রপটে অঙ্কিত ছবির ন্যায় পরে পরে, স্তরে স্তরে দাঁড়াইয়া আছে। কোথাও বা মৃত্তিকাস্তূপের ভিতর হইতে ইমারত দৃষ্টিগোচর হয়; দেখিলে বোধ হয় যেন ভয়ানক ভূমিকম্পে সমগ্র নগরটী উলট-পালট হইয়া গিয়াছে। কোন কোন জায়গায় রাস্তা কাহারও কাহারও বাটীর ছাদ্ অপেক্ষা উচ্চস্থান দিয়া চলিয়াছে, রাস্তাগুলি এত উচ্চে অবস্থিত যে, নিম্নস্থ সকল বস্তুই অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র দেখায়। নিম্নস্থ রাস্তা দিয়া চলিতে চলিতে উপরিস্থিত বাটীর দিকে চাহিলে মস্তকের পাগড়ী খুলিয়া পড়িয়া যায়।

এটোয়া সহরটী বহু প্রাচীন। এখানে অনেক হিন্দু ও মুসলমানের বাস। সহরটীর বর্ত্তমান অবস্থা দেখিলে বেশ অনুমান করা যায় ইহার উপর দিয়া অনেক ভয়ানক ঝঞ্ঝা বহিয়া গিয়াছে।

তখনই মনে পড়িয়া যায় সেই ১১৯৪ সাল, তখনই মনে পড়িয়া যায় মহম্মদঘোরীর সেই ভয়াবহ যুদ্ধের কথা, সঙ্গে সঙ্গে পৃথ্বীরাজের অদ্ভুত বীরত্বের কাহিনী। এই সমৃদ্ধিসংযুক্তা হিন্দুরাজধানীর শিল্প-বাণিজ্য একদিন সমগ্র হিন্দুস্থানের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। কিন্তু যেদিন সুলতান মামুদ তাহার যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, সেই দিন হইতে এটোয়া হৃতসর্ব্বস্বা হইয়া কাঙ্গালিনী সাজিয়াছে। সমগ্র এটোয়াকে একটী দুর্গ বলা যায়। মধ্যে প্রশস্ত সরল পথ নাই যে, বহুসংখ্যক সৈন্য একসঙ্গে পরিচালিত করা যায়। ইহার চতুর্দ্দিক্ মৃত্তিকাপ্রাচীর ও যমুনার দ্বারা সুরক্ষিত। এখানকার হিন্দু-মুসলমানগণ সকলেই পায়জামা ও টুপি পরিধান করিয়া থাকেন। তাঁহাদের ভিতর মোগল সভ্যতার আদবকায়দা এখনও বেশ পরিলক্ষিত হয়। সেই মৃত্তিকাস্পর্শ করিয়া সেলাম এখনও তাঁহাদের ভিতর পূর্ণমাত্রায় প্রচলিত রহিয়াছে। সহরটির চারিদিকে মাটির পাহাড়। এমন পাষাণসদৃশ কঠিন মৃত্তিকা আর কোথাও দেখা যায় না। এ সকল অঞ্চলে বৃষ্টি খুব কম হয়। কিন্তু বৃষ্টি অধিক হইলেও সে জলে এই সকল কঠিন মৃত্তিকার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না।

অল্পদূর আসিয়া একটী বড় পাহাড়ের মত উচ্চস্থান দেখিতে পাইলাম, অনুসন্ধানে বুঝিলাম ঐটিই পৃথ্বীরাজের দুর্গ। পৃথ্বীরাজের দুর্গ ঐখানে জানিয়া সহসা দুর্গের সম্মুখে মস্তক নত হইয়া পড়িল। চক্ষের সম্মুখ হইতে যেন একটী অতীতের পর্দ্দা সরিয়া পড়িল, আমি স্বপ্নমুগ্ধবৎ হইয়া পড়িলাম। বোধ হইল যেন দুর্গের ভিতর হইতে যুদ্ধোন্মুখ রাজপুত সৈন্যের কোলাহল উত্থিত হইতেছে; অশ্বের পদশব্দে যেন চতুর্দ্দিক্ ভরিয়া উঠিল; রাজপুত রমণীগণের রণ-সঙ্গীতে

যেন কর্ণ পূরিয়া গেল। দুর্গের দিকে চাহিয়া দেখি সেই অভ্রভেদী দুর্গচূড়ায় রাজপুত রক্তধ্বজা পত পত শব্দে মোগল-গৌরব খর্ব্ব করিয়া উড্ডীয়মান রহিয়াছে। অগণ্য মোগল-সৈন্য দুর্গাধিকার করিতে প্রাণপণ শক্তিতে বজ্রনাদী কামান দাগিতেছে, কিন্তু শার্দ্দূলবিক্রম রাজপুত বীরগণ তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া অসি-হস্তে অবলীলাক্রমে সেই যমতুল্য আগ্নেয়াস্ত্রের সম্মুখীন হইতেছে। দুর্গপ্রাকারের উপর হইতে রাজপুতরমণীগণ পতি পুত্র, ভ্রাতা ও আত্মীয়স্বজনের বীরত্ব দেখিয়া তাঁহাদের মৃত্যুতে অণুমাত্র অনুশোচনা বা শোক প্রকাশ করিতেছেন না, দুর্গস্থ সকলের জয়োল্লাসে চতুর্দ্দিক পরিপূরিত হইয়া উঠিতেছে। এমন সময় সহসা রামসিং বলিল,—"বাবু এইখান দিয়া দুর্গোপরি যাইবার পথ; যদি উপরে যাইতে ইচ্ছা করেন ত চলুন।" আমি স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় তাহার সঙ্গে কাঁটা-জঙ্গল ভাঙ্গিয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত দুর্গের উপর উঠিলাম। সেইখান হইতে যমুনা বেশ দেখা যায়। সে তটপ্লাবিনী, কৃষ্ণ-বিলাসিনী যমুনা আর তেমন নাই, উদাসিনীর ন্যায় সুখ দুঃখ পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃতির কোলে মৃতের মত পড়িয়া আছে। অতীতের অনন্ত কাহিনী স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য, যেন দুর্গের পার্শ্বে এখন কোনমতে প্রবাহিত হইয়া, কবির কল্পনা জাগাইতে যেন শত হস্ত প্রসারিত করিয়া দুর্গপ্রাকার আলিঙ্গন করিতেছে। এইখান হইতে দুর্গাভ্যন্তরস্থ একটী ইষ্টকনির্ম্মিত বৃহৎ বাটী দেখা যায়, উহা নাকি পৃথ্বীরাজের দুর্গস্থিত বাসভবন। গবাক্ষ কপাট-বিহীন, বাসভবনটি নরকঙ্কালের ন্যায় কালের কঠোর শক্তি ঘোষিত করিতেছে। দুর্গের ভিতর হইতে পয়ঃপ্রণালীগুলি আসিয়া যমুনায় পড়িয়াছে। ঐ জলনির্গমের পথগুলি যেন এখনও নূতন রহিয়াছে। দুর্গের ভিতর প্রবেশ

করিবার ইচ্ছা থাকিলেও সত্য বলিতে কি, সাহসে কুলাইল না। সুতরাং দুর্গের অভ্যন্তর সম্বন্ধে কোন বিশেষ সংবাদ দিতে পারিলাম না।

তবে শুনিলাম দুর্গের অভ্যন্তরে অনেক বড় বড় বাড়ীর ভগ্নাবশেষ এখনও বর্ত্তমান আছে। কিন্তু কোনটির ছাদ সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, কোথাও বা কক্ষগুলি ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে, সংস্কার বিহনে দিন দিন এই দুর্গের চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে। তবে কয় শতাব্দীর ঘোরতর বিপ্লববিপর্য্যয়ের ভিতর দিয়া সে যে আত্ম-অধিকার রক্ষা করিতে পারিয়াছে তাহা হিন্দুভাস্করদিগের অত্যাশ্চর্য্য শিল্পনৈপুণ্যের গুণে; কিন্তু আর বুঝি পারে না। এই দুর্গের অনতিদূরে মনুমেণ্ট অপেক্ষা অধিক উচ্চ এক শিবমন্দির দৃষ্ট হয়। কথিত আছে, শিবলিঙ্গ পৃথ্বীরাজের দ্বারা স্থাপিত। দৈনিক পূজার বন্দোবস্ত এখনও ঠিক চলিতেছে। পৃথ্বীরাজের কন্যা নাকি প্রতিদিন এই একলিঙ্গ শিবের আরাধনা করিতেন। আনন্দ উৎসাহে, হর্ষে বিষাদে ছুটিয়া গিয়া মন্দিরে উঠিলাম, তখন কত কথা মনে পড়িল, কত ইতিহাসের বর্ণনীয় চিত্র বাস্তবে পরিণত হইয়া উঠিল; চক্ষে জল আসিল। সেখান হইতে একবার দুর্গের দিকে, একবার নিম্নপ্রবাহিনী যমুনার দিকে, এটোয়ার দিকে অনিমেষ-নয়নে দৃষ্টিপাত করিলাম। আগ্রহ-আকাঙ্ক্ষা-উৎসাহ-পরিপূরিত হৃদয়ে মহেশের চরণপদ্মে প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার আশীর্ব্বাদের সঙ্গে পৃথ্বীরাজের দুর্গের স্মৃতি হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া আনিয়াছি। তবে এই দুর্গ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক গবেষণা করিবার ক্ষমতা বা শক্তি আমার নাই, সুতরাং সে সম্বন্ধে পাঠকের আশা পূর্ণ করিতে পারিলাম না। কোন ঐতিহাসিক যদি এই দুর্গের অজ্ঞেয়তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে প্রয়াস পান, তাহা হইলে হয়ত আমরা অনেক বিষয় জানিতে পারিব।

কালকা পথে।

সে আজ দুই বৎসরের কথা হইলেও বেশ স্মরণ আছে। একদিন ভোর হয় হয়, টুণ্ডুলার বাসার শয্যায় পড়িয়া এ পাশ ও পাশ করিতেছি, শীতের ঠাণ্ডা বাতাস জানালার ফাঁক দিয়া গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতেছে। আলস্যবশতঃ অন্ধকারকে আরও খানিকক্ষণ থাকিবার নিমিত্ত অনুনয় অনুরোধ করিতেছি ; এমন সময় আমাদের বাসার নীচে হইতে কে যেন বিকট চীৎকার করিয়া কাহাকে ডাকিতে লাগিল। হিমনিষিক্ত বাতাসে বোঝা যাইতেছিল না যে, স্বরটি বাঙ্গালী কি হিন্দুস্থানীর কণ্ঠনিঃসৃত। কাণ খাড়া করিয়া রহিলাম, বিশেষ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আমাদের সিঁড়ীর দরজায় যষ্টির আঘাত সুরু হইল। কোথা হইতে আপদ্ আসিল মনে করিয়া তাড়াতাড়ি গিয়া দ্বার খুলিয়া দিলাম। তার পর যাহা দেখিলাম তাহাতে অঙ্গ শীতল হইয়া গেল! মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ী বাঁধা, সমস্ত শরীর কম্বলে আচ্ছাদিত, নাগরা পায়ে, দুইজন স্থূলকায় হিন্দুস্থানী! তাজ্জব ব্যাপার! তাহারাও আমার মত একজন সুপ্তোত্থিত দুর্ব্বল বাঙ্গালীকে নিরীক্ষণ করিয়া নির্ব্বাক্! পরস্পর পরস্পরের মুখের প্রতি একবার নৈরাশ্যের শূন্য দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম।

৺পূজার সময় পশ্চিম বেড়াইতে গিয়া টুণ্ডুলায় আমার একটী বন্ধুর বাসায় অবস্থান করিতেছিলাম। বন্ধুবর চোখ উঠার জন্য বড় কষ্ট পাইতেছিলেন। তিনি পরিবার লইয়া ভিতর বাড়ীতে থাকেন ; আমি বহির্ব্বাটিতে থাকি। সুতরাং এই হাঙ্গামা তাঁহাকে পোহাইতে হইল না। চোখ রগ্ড়াইতে রগ্ড়াইতে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমরা

কাহার অনুসন্ধান করিতেছ ?” আমার বন্ধু যে আপিসে কর্ম্ম করেন, সেই আপিসের জয়শঙ্কর বাবুর আত্মীয় বলিয়া তাহারা পরিচয় প্রদান করিল। জয়শঙ্কর বাবুর সহিত আমার ইতিপূর্ব্বেই বিশেষ আলাপ পরিচয় হইয়াছিল। তিনি বড়ই ভদ্রলোক। আমি আগন্তুকদিগকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার বাসা চিনাইয়া দিয়া আসিলাম।

ইতিপূর্ব্বেই আমার তাজ, সিকান্দ্রা প্রভৃতি দেখা হইয়া গিয়াছিল। সে দিন আর কোনখানে যাইবার কথা ছিল না। মধ্যাহ্নে প্লাট্‌ফরমে গিয়া বসিয়া রহিলাম। বাঙ্গালী যাত্রী দেখিলেই ছুটিয়া গাড়ীর নিকট গিয়া উপস্থিত হই। নানাপ্রকার প্রশ্নাদিতে যথেষ্ট আনন্দ অনুভব করি।

পরদিন সকালে বিছানায় পড়িয়া আছি—রাত্রে ভাল নিদ্রা হয় নাই। গৃহে অল্প অল্প আলো আসিয়াছে। এমন সময় শুনিলাম—“ও মহাশয়, আপনি কৈ ? বলি বিদেশে বায়ুপরিবর্ত্তন করিতে আসিয়া কি এত বেলা পর্য্যন্ত ঘুমাইতে হয় ? উঠুন ! উঠুন !” কণ্ঠস্বর বেশ পরিচিত বলিয়া মনে হইল। এত ভোরে কে আসিল ! দৌড়াইয়া গিয়া দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দিতে না দিতে, ভদ্রলোক বাহির হইতে বলিলেন,—“এ যে দেখ্‌ছি এখনও আপনার চোখে ঘুম জড়িয়ে রয়েছে।”

আমি বলিলাম, “উপেন সাহেব যে, এত ভোরে কেমন ক’রে এলে ?” আমরা তাঁহাকে সাহেব বলিয়া ডাকিতাম ; কারণ তিনি প্রায় সাহেবী ধরণের পোষাক পরিতেন। তিনি উত্তর করিলেন, “কলের গাড়ী করে।”

“এখন ত কোন up train নাই, আসিলেন কেমন করিয়া ?”

“up না থাকতে পারে, down ত আছে।”

"up এই বা গেলেন কবে ?"

"Inquistive হওয়া চাই ! পড়ে পড়ে ঘুমুলে হয় না। চলুন, ধড়া চূড়া ছেড়ে একবার খাঁটি স্বদেশী হই। তার পর সব কথা হবে।"

তখন উভয়ে গৃহের মধ্যে আসিয়া বসিলাম। তিনি বলিলেন,—"তোমার আলিগড় যাবার খবর পথে পাই। সে জন্য বরাবর আলিগড় গিয়া অবতরণ করি। সেখানে শুনিলাম তুমি সেখান হইতে আজ চার পাঁচ দিন টুণ্ডুলায় চলিয়া আসিয়াছ। অমনি পরবর্ত্তী ট্রেণের অনুসন্ধানে বাহির হইয়া জানিলাম, ডাউন মেল ছাড়া আর গাড়ী নাই। তাহাতেই চড়িয়া বসিলাম। এখানে অন্ধকার থাকিতে থাকিতে গাড়ী পৌঁছিয়াছিল। কেবল পথে জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতে বিলম্ব হইয়াছে। অক্ষয়বাবু কেমন আছে বল ?" এমন সময় অক্ষয়বাবু সেখানে উপস্থিত হইলেন। সে দিন বড় আনন্দে কাটিল। মধ্যাহ্নে পরামর্শ হইল, কালকা দেখিয়া আসা যাক। উপেন বাবু বলিলেন, "কেবল উইয়ের ঢিপি দেখিয়া রাখিয়াছেন, চলুন পাহাড় কাহাকে বলে একবার দেখিয়া আসিবেন।"

সেই রাত্রে আহারাদির পর টুণ্ডুলা হইতে কালকার পথে রওনা হওয়া গেল। কথা রহিল, আমরা ফিরিয়া পুনরায় টুণ্ডুলায় আসিব ; কারণ অক্ষয় বাবু তাঁহার চোখের জন্য আমাদের সঙ্গী হইতে পারিলেন না। গাড়ী উদ্দাম গতিতে ছুটিয়া চলিল।

সারা রাত্রি বাষ্পযান ছুটিয়া চলিল। বন্ধুপ্রবর নিদ্রাদেবীর বড় ভক্ত ও অনুরক্ত সেবক। আমরা যে কম্পার্টমেণ্টে উঠিয়াছিলাম তাহাতে অন্য কোন আরোহী ছিল না ; সুতরাং তিনি কম্বল মুড়ি দিয়া বিকট নাসিকা-গর্জ্জনে ক্ষুদ্র গাড়ীখানিকে শব্দান্দোলিত করিয়া তুলিলেন। গাড়ী যতই কালকা অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে, ততই

হিমকণা সমস্ত জানালা বন্ধ থাকা সত্বেও কোথায় ক্ষুদ্র কোন রন্ধ্রপথে প্রবেশ করিয়া স্নেহালিঙ্গন আবেশে শরীর অসাড় করিবার উপক্রম করিতেছে। উঃ! সে কি ভয়ানক ঠাণ্ডা! গরম কোট ও কম্বলে অনেকটা নিরাপদ থাকিব মনে ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু এখন বেশ হৃদয়ঙ্গম হইল তুষার-কিরীটি হিমাদ্রির দূতটি বড় উপেক্ষার লোক নন। তখন রাত্রি প্রায় দুইটা বাজিয়াছে। গাড়ী অনেকক্ষণ অন্তর মাঝে মাঝে বিশ্রাম লইতেছে। এবার যেখানে তাহার উদ্দাম গতি সহসা নিস্তেজ ও নীরব হইয়া আসিল, জানালার কাঁচের ভিতর দিয়া দেখিলাম, সেস্থানের নাম ষ্টেশনের উপর পাথরের গাত্রে বড় বড় অক্ষরে ক্ষোদিত রহিয়াছে "দিল্লী"। আমি পূর্ব্বে কখনো দিল্লী আসি নাই, ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের সময় ও ভাড়া নিরূপণ পুস্তক লইয়া বহুবার তাহার দূরত্ব ও ভাড়া লইয়া অঙ্কপাত করিয়াছি মাত্র। আজ দিল্লীর ষ্টেশনে গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলে অনেক পুরাতন কথা মনে পড়িল। গাড়ী এখানে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে। এক একবার মনে হইল, এইস্থানে অবতরণ করি। যে দিল্লী হিন্দুর অতীত কাহিনী বক্ষে করিয়া কত যুগযুগান্তর হইতে, তাহার ঐশ্বর্য্য—তাহার সৌন্দর্য্যের গৌরবদীপ্তি লইয়া দাঁড়াইয়া আছে,—তাহার সহিত, তাহার সুখৈশ্বর্য্যের সহিত, তাহার অতুলনীয় হর্ম্ম্য অট্টালিকার ভগ্নাবশেষের সহিত, তাহার ধূলিকণার সহিত একবার প্রাণ মিলাইয়া দিই! এ নরজন্ম সার্থক করি!

কিন্তু সে গভীর রাত্রিতে নামিয়া কোথায় যাই? বন্ধুপ্রবরকে উঠাইতে বৃথা প্রয়াস পাইলাম। তিনি তখন ঘুমের ঘোরে মধুর স্বপ্নে অজ্ঞান। তখন মনে পড়িল বৈচিত্র্যময়ী হস্তিনার কথা, সঙ্গে সঙ্গে আরো মনে পড়িল হিন্দুর জ্ঞান বুদ্ধি ও বিদ্যার একাধিপত্য।

একদিন ছিল, যখন সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর হইলে কি হয়, সেও লোলুপ দৃষ্টিতে এই শোভাময়ী বীরপ্রসবিনী বীরভোগ্যা হস্তিনার প্রতি চাহিয়া থাকিত। ইহারই কোলে কত রাজন্যবর্গ কত খেলাই না খেলিয়াছেন? কত ভীষণ সংগ্রামের দুর্দ্ধর্ষ সংঘাতে কত রাজবংশ চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইয়াছে। কোথায় আজ সে হস্তিনার সুখৈশ্বর্য্য! কোথায় বা তাহার বীরপুত্রগণ!

গাড়ী পুনরায় ছুটিতে আরম্ভ করিল। গতি তেমনি উদ্দাম, তেমনি দ্রুত। এবার আর শয়ন করিলাম না, জানালার কাঁচের উপর মুখ রাখিয়া দেখিতে লাগিলাম। কাঁচের উপর মুক্তার ন্যায় শিশিরকণা জমিয়া থাকায় বাহিরের দৃশ্য বড়ই অস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছিল। চন্দ্রদেব পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িয়াছেন। আকাশ, মেঘ, মুক্ত-প্রান্তর যেন নিশীথে নীরবে মধুর মিলনে মিলিয়াছে। যেন প্রকৃতি সতী ধরণীর বক্ষে বিরাম-নিদ্রায় অভিভূত, প্রেমিকের প্রীতিঅশ্রুর ন্যায় নিহারবিন্দুগুলি তাহার বক্ষে কণ্ঠে জড়াইয়া রহিয়াছে। শান্ত নীরব নিশা। দূরে, বহুদূরে অস্পষ্ট আবছায়ার মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীরগুলি দৃশ্যপথে এক একবার পড়িয়া তখনি বায়স্কোপের চিত্রের মত মিলাইয়া যাইতেছিল। এরূপ মনোরম দৃশ্য বুঝি কখন দেখিব না।

যখন সেই শীতের ভোর রাত্রে ঊষার প্রথম বাতাস অল্প অল্প বহিতে সুরু করিয়াছে, তখন গাড়ী পাণিপথ ষ্টেসনে আসিয়া পৌঁছিল। তাড়াতাড়ি জানালার কাঁচখানি নামাইয়া মুখ বাড়াইয়া দেখি দিগন্তব্যাপী মুক্ত প্রান্তর। মাঝে মাঝে শাল, মৌ ও বাবলা প্রভৃতি বৃক্ষরাজি শিশিরমণ্ডিত; যেন অতীত গৌরব-কাহিনী স্মরণ করিয়া নয়নজলে ভাসিতেছে। মনে হইল এই সেই রণক্ষেত্র, যেখানে কতবার ভারতের ভাগ্য পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, যেখানে

রাজপুত তাহার অসীম বীরত্ব দেখাইয়া হাসিতে হাসিতে রণশয্যায় চিরশয়ন করিয়াছে। তারপর যখন কুরুক্ষেত্রে আসিয়া গাড়ী পৌঁছিল তখন এক অজ্ঞাত আনন্দে শরীর রোমাঞ্চিত হইল। এই সেই স্থান—যেখানে ভারতের ধর্ম্মযুদ্ধ হইয়াছিল,—যে পবিত্র স্থানে অষ্টাদশ অক্ষোহিণী সৈন্য একদিন এক সময়ে সমবেত হইয়াছিল। যে যজ্ঞে ভারত তাহার সমগ্র বীরশক্তি, ঐশ্বর্য্য বিসর্জ্জন করিয়াছিল,—এই সেই মহাভারত-কথিত "কুরুক্ষেত্র"। "কুরুক্ষেত্র" এই কথা স্মরণ হইতে হৃদয় দুঃখে, হর্ষে কেমন হইয়া গেল। মনে হইল, যেন কোন অজানা দেশে স্বপ্নাবেশে ভাসিয়া চলিয়াছি—আমাকে যেন দুর্ব্বল বঙ্গবাসী বলিয়া আর মনে করিতে বাসনা হইল না। মনে হইল আমিও যেন জন্ম জন্মান্তরে ঐ যুদ্ধে কেহ ছিলাম। আমিও যেন উভয় সৈন্যের মধ্যস্থিত রথে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে, অর্জ্জুনের সারথ্য করিতে অবলোকন করিয়াছি,—আমিও যেন তাঁহার পলাশপুষ্পবৎ আরক্তিম চরণকমলে অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া নিজেকে কৃতার্থ করিতে বিমুখ হই নাই! ধন্য কল্পনা! ধন্য তোমায়! যাক্, এত বেশী কথা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া অনুমিত হইতে পারে। এইবার কাল্কার কথা বলিয়া প্রবন্ধের নামের সার্থকতা করিতে প্রয়াস পাইব।

এইবার মেল্ ট্রেণ কর্ণাল আসিয়া থামিল। বলিতে ভুলিয়াছি, দিল্লীর পর হইতে মেলের উদ্দাম গতি কিছু মন্থর হইয়া আসিতেছিল; কারণ এবার গাড়ীকে ক্রমে ক্রমে উঁচুতে উঠিতে হইতেছে। এখন হইতে মাঝে মাঝে খণ্ড খণ্ড মেঘের ন্যায় দূরে ছোট বড় পর্ব্বতশ্রেণী নয়নগোচর হইতেছিল। কর্ণাল একটী অতি প্রাচীন নগর। কথিত আছে, মহাবীর কর্ণ ইন্দ্রপ্রস্থের

নিকট বলিয়া এই স্থানে তাঁহার রাজধানী সংস্থাপন করেন। সে আজ কত যুগযুগান্তরের কথা। তবুও কি আশ্চর্য্য! যখন গাড়ী কর্ণালে আসিয়া দাঁড়াইল, তখনি যেন অজ্ঞাতভাবে অতীত ঘটনাগুলি নিদ্রোত্থিত শিশুর ন্যায় কল্পনার কোলে নাচিয়া উঠিল। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, কৃষ্ণ, ব্যাস, ভৃগুরাম যেন সব সেদিনকার লোক, যেন অনতিকালপূর্ব্বেই এই সকল ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, যেন পাঞ্চজন্য শঙ্খধ্বনি বাতাসে এখনও ধ্বনিত হইতেছে, যেন শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখনিঃসৃত গীতার শ্লোকগুলির শেষ উচ্চারণ এখনও পরিসমাপ্ত হয় নাই।

পাঁচটার সময় আমাদের গাড়ী থানেশ্বর পার হইয়া গেল। ইহার পর পথের কোন কথা আর তেমন উল্লেখযোগ্য বলিয়া স্মরণ হয় না। এই সময় বন্ধুবর নিদ্রা হইতে উঠিলেন ও বলিলেন, "উঃ বড় শীত! এত শীত কখন আসিল? আপনার শীত করিতেছে না?" আমি বলিলাম, "আর একটু নিদ্রা দিন, আর কেন, সামান্যের জন্য জাগিয়া থাকিবেন?" তিনি হাসিয়া উত্তর করিলেন, "আপনার মত ত আর আমার বাতিক প্রবল হয় নাই যে, গাছপালা পাহাড় দেখিয়া এই দারুণ শীতে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিব।"

সকাল সাতটার সময় পাঞ্জাব মেল্ বহু সাধ্যসাধনার পর আকাঙ্ক্ষিত কাল্‌কায় আসিয়া হাঁপ ছাড়িল। কাল্‌কা কলিকাতা হইতে ১০৬৫ মাইল দূরে অবস্থিত। সমতলভূমি হইতে ২০০০ ফুট উচ্চ। এই খানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রেল শেষ হইয়াছে। এখান হইতে কাল্‌কা-সিমলা রেলে চড়িয়া সিমলা যাইতে হয়। গাড়িগুলি বড় ছোটো। চারিজন আরোহী একত্র

বসিলে বড় ঘঁ্যাসাঘেঁসি হয়। গাড়ী হইতে নামিয়া দেখি, আমাদের পরিচিত নগেন বাবু ষ্টেশনে বেড়াইতেছেন। পূর্ব্ব হইতে জানিতাম, তিনি কাল্‌কায় কর্ম্ম করেন। তিনি আমাদের পাইয়া বিশেষ আহ্লাদিত হইলেন। নানাপ্রকার কুশলাদি প্রশ্নে আপ্যায়িত করিতে করিতে তাঁহার বাসায় গিয়া উঠিলাম। তিনি ও তাঁহার স্ত্রী দুইজনে এখানে থাকেন। উপেনবাবুর বাসা সমতল-ভূমি হইতে কিছু উচ্চে ও পাহাড়ের কোলে। চারিদিকে অভ্রভেদী পর্ব্বতশ্রেণী। কাল্‌কা, আকাশ ও পাহাড়ের মহা সম্মিলন-ক্ষেত্র। আমরা আমাদের জিনিসপত্র রাখিয়া বেড়াইবার জন্য বাহির হইতে উদ্যত হইলাম। তিনি অনুরোধ করিলেন "আহারাদির পর যাইবেন।" আমি বলিলাম, "তাহাই হইবে— তবে কি না, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত না চলিয়া পা একপ্রকার অসাড় হইয়া গিয়াছে, একটু ছাড়াইয়া আনি।" এক এক পেয়ালা চা খাইয়া, বাসা হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। উপেন বাবু বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন, যেন বেশী বিলম্ব না হয়।

পথে বাহির হইতেই কি এক অজানা আনন্দে প্রাণ পুলকিত হইয়া উঠিল। ষ্টেশনের সম্মুখ হইতে ধূলিসমাচ্ছন্ন কাল পাথরে মোড়া মল-রোড্ বাহির হইয়া পর্ব্বতগৃহের অন্দরে প্রবেশ করিয়াছে। রাস্তাটী যেন জাহাজে উঠিবার জেটির মত ক্রমে ক্রমে উঁচু হইয়া গিয়াছে। এইখানে অনেকগুলি ছোট ছোট ঘোড়া লইয়া পাহাড়ীরা যাত্রীর অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকে। যদিও এখন কাল্‌কা হইতে রেলপথ পাহাড়ের গাত্র বেষ্টন করিয়া ইংরাজ ইঞ্জিনিয়ারের অপূর্ব্ব বুদ্ধি, কৌশল ও শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়া, ঘুরিয়া ফিরিয়া কখন উপরে উঠিয়া কখন নীচে নামিয়া পাহাড়ের বক্ষের উপর দিয়া

সিমলা পর্য্যন্ত গিয়াছে, তথাপি পূর্ব্ব সময়ের ব্যবহৃত "টঙ্গা" এখনও অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। টঙ্গার ভাড়া রেলভাড়া অপেক্ষা না কি কম। এখনও অনেকে রেলগাড়ী অপেক্ষা টঙ্গা অধিক পছন্দ করেন।

অল্পদুর অগ্রসর হইয়া দেখি সারি সারি দোকান পসার। বেশ ক্ষুদ্র সহর। এখানেও নানা জাতীয় লোক ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে বাস করিতেছে। এখানকার লোক প্রায় সকলেই পাহাড়ী, হিন্দু ও মুসলমান। কাল্‌কা হইতে কিছুদূরে একটী সুন্দর উদ্যান আছে। উহা একজন করদ রাজার নির্ম্মিত। উপবনের শোভা বড়ই মনোরম ও প্রীতিপ্রদ। পূর্ব্বে যখন সিমলা পর্য্যন্ত রেল বিস্তার হয় নাই, তখন সম্ভ্রান্ত লোকেরা এই বাগানে বিশ্রাম লাভ করিয়া পরে, টঙ্গায় বা অশ্বপৃষ্ঠে সিমলায় যাত্রা করিতেন।

একটী দোকানে জলযোগ করিয়া, মল-রোড ধরিয়া চলিলাম। কোথায় যাইব, কোথায় যাইতেছি কখন বাসায় ফিরিব এরূপ কোন চিন্তাই মনে স্থান পাইল না। কেবলই চলিয়াছি। বড় আনন্দ, বিপুল উৎসাহ। এক একটী গিরিশ্রেণী যেন আমাদের সঙ্গে পথ চলিতে অসমর্থ হইয়া পশ্চাতে লুকাইয়া পড়িতেছে, তাহাদেরই পার্শ্ব হইতে বৃহৎ হইতে বৃহত্তর বিস্তারের পর বিস্তার, শ্রেণীর পর শ্রেণী পর্ব্বতমালা পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। কখন দ্রুত পদবিক্ষেপে, কখন মন্থর গতিতে, কখন বা ছুটিয়া, কেবলি উঁচুতে উঠিতে সুরু করিলাম। মাঝে মাঝে নির্ঝরিণীর কল কল তান, নিস্তব্ধ পাহাড়ের কোলে বড়ই মনোহর। চতুর্দ্দিকে গগনস্পর্শী পর্ব্বতশ্রেণী, মেঘের কোলে মস্তক হেলাইয়া যেন ঘুমাইয়া রহিয়াছে। নিম্নে ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ অসরল পথ। আমার তখন পিপাসা পাইয়াছিল—মনে হইল প্রথম যেখানে জল দেখিব, তাহা আবিল হইলেও পান করিব। কিয়দ্দূর

অগ্রসর হইতে না হইতেই দেখিলাম একটী স্থানে ঝরণার জল সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে। দেখি অল্প দূরে পর্ব্বতগাত্র ভেদ করিয়া ঝরণার জল ঝর ঝর শব্দ করিয়া পড়িতেছে।

একটু অগ্রসর হইয়াই অঞ্জলি পূরিয়া সেই ঝরণার জল পান করিলাম। কাল্‌কা ত্যাগ করিয়া পাহাড়ে আরোহণ করিলে, একটু পরেই যে ঝরণাটি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও নিতান্ত ছোট নয়। সেইখান হইতে কাল্‌কা অঞ্চলের অধিবাসীরা জল সংগ্রহ করিয়া থাকে। সেই ঝরণার নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিবার বড় ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এখানকার স্নানের রীতি আমাদের চক্ষে বড়ই অস্বাভাবিক ও অপ্রীতিকর বলিয়া বোধ হইল। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ে পরিধেয় বস্ত্রাদি দূরে রাখিয়া অসংশয়ে ও অসঙ্কুচিত ভাবে একত্র স্নান ও গাত্রাদি প্রক্ষালন করিয়া থাকে। ইহাদের আচার ব্যবহারই এইরূপ! ইহাতে ইহারা কোন প্রকার অন্যায় বা লজ্জা বোধ করে না। এই সকল ঝরণার জলের নিকট কলিকাতার কলের জল স্বচ্ছতায় আবিল বলিলে অন্যায় বলা হয় না। এ জল যেমন নির্ম্মল, তেমনি স্নিগ্ধ ও সুস্বাদু। জল পান করিয়া যেন সমস্ত ক্লান্তির অবসান হইল।

উৎসাহে উল্লাসে ক্রমান্বয়ে সেই পাহাড়ের পথ ধরিয়া চলিতে লাগিলাম। মাঝে মাঝে এক এক বার থম্‌কিয়া দাঁড়াই, আর নিবিড় নিস্তব্ধ পর্ব্বতের উপর আমাদের জুতার খট্ খট্ শব্দও যেন সমভিব্যাহারী সঙ্গীর মত স্তব্ধ হইয়া থামিয়া যায়। আমাদের স্বাধীন কৌতূহল, উচ্চ হাস্য ও কথোপকথনে পরিপূর্ণতা লাভ করিয়া বিরাট গাম্ভীর্য্যের ভিতর এক অভিনব শিশু-সুলভ চাঞ্চল্যের চিত্র অঙ্কিত করিয়া দিতেছিল।

এক উপলখণ্ডের উপর বন্ধুবর উপবেশন করিলে আমিও তাহার পার্শ্বে বসিয়া পড়িলাম। সম্মুখে একটী ঝরণা ঝির-ঝির করিয়া বহিয়া চলিয়াছে। এই ক্ষুদ্র ঝরণাই যে পরে সমতল ক্ষেত্রের উপর দিয়া বিপুল কলেবরে কত দেশ বিদেশ, কত জানা অজানা স্থান, কত উর্ব্বর অনুর্ব্বর ক্ষেত্রকে সুশীতল বারি দান করিয়া চলিয়াছে, তাহা এই ক্ষীণাঙ্গীকে অবলোকন করিলে মোটে নির্ণয় করিতে পারা যায় না।

পাহাড়ের উঁচু নীচু পথে উঠিতে ও নামিতে বড় মন্দ ব্যায়াম হয় না। কোটের ভিতরের কামিজটি ঘামে ভিজিয়া গিয়াছিল। কিন্তু বসিতে না বসিতেই সুশীতল বায়ুস্পর্শে তাহা এক মুহুর্ত্তে শুকাইয়া গেল। পর্ব্বতের জলে ও বাতাসে, জানি না, কি এক অজ্ঞাত শক্তি আছে, যাহা ক্লান্তি ও অবসাদকে শীঘ্র দূর করিয়া দেয়। বিশ্রাম করিবার বাসনা হইলেও অল্পক্ষণ বিশ্রাম করিতে না করিতে, পুনরায় চলিবার ইচ্ছা অনেক বেশী পরিমাণে জাগিয়া উঠে। আমরা উঠিয়া পড়িলাম। নবোৎসাহে সবে মাত্র চলিতে সুরু করিয়াছি, অমনি পাহাড়ের উপর একটী ছায়া আসিয়া পড়িল। আমাদের মাথার উপরকার মেঘাবৃত আকাশের ছায়া বলিয়া মনে হইল। পূর্ব্বে জলধর বাবুর 'হিমালয়ে' পড়িয়াছিলাম যে, যদি পর্ব্বতের উপর একবার বৃষ্টি সুরু হয়, তাহা অত্যন্ত ভয়ানক, কারণ সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ঝড় আসিয়া যোগ দেয় এবং তাহাতে সমূহ বিপদপাতের সম্ভাবনা।

নিম্নে অবিচ্ছিন্ন অনন্ত গিরিশ্রেণী,—একটীর পর একটী—মনে হয় যেন ঐ শেষটীর পর আর নাই;—কিন্তু তাহার পর বুঝি—সবই ভুল। যেমন দিনের পর দিনের শেষ নাই, তেমনি মনে হয়, এই

অভ্রভেদী পর্ব্বতমালার শেষ নাই—সীমা নাই—অন্ত নাই ; এখানে আকাশ হিমালয়কে আলিঙ্গন করিয়াছে এবং হিমালয় আকাশকে স্নেহবাহুপাশে বদ্ধ করিয়া উল্লাসে আত্মপর জ্ঞানশূন্য হইয়াছে।

আবার উর্দ্ধে চাহিয়া দেখি, আর মেঘের লেশমাত্র নাই ; এক ঝাঁক পাখী, আকাশ জুড়িয়া উড়িতেছে, তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমবেত পাখায় সূর্য্যরশ্মি অবরুদ্ধ। এত পাখী এক সঙ্গে কখন দেখি নাই, শিশুর মত উর্দ্ধমুখে তাকাইয়া রহিলাম। সেগুলি কোন্ জাতীয় বিহঙ্গম, তাহা নির্ণয় করিতে পারিলাম না, আর সেই জনশূন্য পর্ব্বত-প্রদেশে আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিবার মত কেহই ছিল না।

পাহাড়ের পথ মাঝে মাঝে তৃণসমাচ্ছন্ন ; এই সকল শ্যামল তৃণের ভিতর আর এক রকম ছোট ছোট তৃণ পরিলক্ষিত হয়, সেগুলিও আবার নয়নাভিরাম নানা বর্ণে রঞ্জিত, ফুলভারাবনত। যেন এক এক খানি নানা বর্ণের বিচিত্র আসন অতিথি অভ্যাগতের জন্য প্রকৃতিসুন্দরী মঙ্গল হস্তে পাতিয়া রাখিয়াছেন। এই বিলাস-বিহীন তৃণদলের উপর উপবেশন করিলে, হৃদয় ভক্তিভরে ভগবানের চরণে লুটাইয়া পড়ে; অহঙ্কার, বিলাসিতা, সব এক নিমেষে বিলুপ্ত হইয়া যায়।

আমরা একটা বাঁকের মুখে আসিয়া পড়িলাম। এইখান হইতে পথটি একেবারে উত্তর হইতে পশ্চিমে ফিরিয়াছে, অপর একটি সরু পথ পাহাড়ের অন্য দিকে চলিয়া গিয়াছে। আমরা এখন কোন্ পথ অবলম্বন করিব ? দুই জনেই সমান পণ্ডিত, পরস্পরের মুখের প্রতি তাকাইলাম, এখানে ত আর গলির মোড়ে বা রাস্তার আরম্ভ-মুখে অমুক লেন বা ষ্ট্রীট, পথিকের সুবিধার জন্য নির্দ্দেশ করা নাই ; এখানে উর্দ্ধে আকাশ—আর নিম্নে পাহাড়।

কোন্ দিকে যাই ইতস্ততঃ করিতেছি, এমন সময় দেখি প্রায়

দুই শত বড় বড় ছাগল ও অশ্ব, পৃষ্ঠে বোঝা বহন করিয়া সেই বড় পথে নামিয়া আসিতেছে। মনে হইল, এ আবার কি? তারপর দেখি, তাহাদের সমভিব্যাহারী পরিচালকবর্গ পাহাড়ী; হাতে বড় বড় যষ্টি, মাথায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাগড়ী, সকলের অঙ্গে হাতকাটা জামা। তাহারা বেশ হৃষ্টপুষ্ট. উন্নতবক্ষ, বিস্তৃতললাট। তাহাদের শরীরের প্রতি শিরায় যেন স্বাস্থ্য ও শক্তি পরিস্ফুট রহিয়াছে। তাহারা বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে, আমাদের দিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিল। এই সময় সহসা কোথা হইতে ঝড়ের মত শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল। কোথাও কিছু নাই অথচ ঝড় আসিল। ব্যাপার কি জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলাম "এ কিসের শব্দ, ঝড় এলো কি?" তাহারা প্রশ্নটা ঠিক বুঝিয়াছিল কি না বলিতে পারি না, তবে তাহাদের বড় বড় অধরের উপর বিদ্যুৎ চমকের মত একটু হাসি খেলিয়া গেল। তাহারা এরূপ শব্দের কারণ জানিত; বলিল "ও রেলগাড়ী আস্‌ছে।" কিন্তু পরক্ষণেই শব্দ নিস্তব্ধতায় ডুবিয়া গেল; বন্ধু ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দী ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলেন "যদি রেল গাড়ীর শব্দ হয়, তবে আর শোনা যাইতেছে না কেন?"

একজন সেলাম করিয়া বলিল, "হুজুর, গাড়ী এখন একটা নীচু পাহাড়ে নামিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে আসিতেছে, সেজন্ত শব্দ শুনা যাইতেছে না।" তারপর, আমাদের মাথার উপরের একটী পর্ব্বত নির্দ্দেশ করিয়া পুনরায় বলিল "ঐখান দিয়া রেল গিয়াছে; একটু পরেই গাড়ী দেখিতে পাইবেন।"

বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা কোথায় যাইবে?"

"কাল্‌কার বাজারে। সেখানে এই সব মোট রাখিয়া পুনরায় মোট লইয়া ফিরিব। ইহাই আমাদের কাজ।"

"এ সব বোঝা কাহাদের? তাহারা রেলে লইয়া যায় না কেন?"

"সিমলার রেলের মাশুল অত্যন্ত বেশী, তাই আমরা কাল্‌কা পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া দিয়া আসি। এই রাস্তায় ভাড়া খুব কম পড়ে।"

"রেল লাইন খুলিয়া তোমাদের আয় অনেক কমিয়া গিয়াছে?"

"না, ঠিক বিপরীত হইয়াছে, আয় পূর্ব্ব অপেক্ষা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। রেল হওয়ার পর লোকজন বেশী আসে, 'মোট ঘাট' অনেক বাড়িয়াছে, রেলের মাশুল অনেক বেশী।"

তাহাদের সঙ্গে বালক, শিশু, স্ত্রীলোক। সকলের নিকট বস্ত্রাদি, আহার্য্য ও শয্যা ইত্যাদি ছিল। তাহাদের বেশ রীতিনীতি, পর্ব্বতের সকল প্রদেশেই যেন তাহাদের পরিচিত ঘর! ভয় নাই যে কোথায় গিয়া পড়িব, কোথায় আহার জুটিবে, কোথায় বা শয়ন করিব। তাহারা কিরূপ কষ্ট স্বীকার করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করে, দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

কোন্ পথে যাইলে নিকটবর্ত্তী রেলওয়ে ষ্টেশনে পৌঁছিতে পারিব জিজ্ঞাসা করিলে একজন বলিল—"হজুর, আপনারা কাল্‌কা হইতে সাত মাইল পথ চলিয়া আসিয়াছেন, এর একটু পরেই "টাঁকশাল" নামক ক্ষুদ্র গ্রাম।"

সেখানে বাজার আছে কি না অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিলাম, টাঁকশাল অতি সামান্য গ্রাম; তিন চার ঘর মাত্র পাহাড়ীর বাস আছে; তাহাদের যাহা কিছু প্রয়োজন হয় তাহা কাল্‌কা বাজার হইতে আনাইয়া লয়। Dandy Road নামক একটী পথ দূরবর্ত্তী পাহাড়ের গাত্রে দেখাইয়া একজন বলিল "ঐ পথ অবলম্বন করিলে খুব শীঘ্র টাঁকশাল ষ্টেশনে উপস্থিত হইতে পারিবেন।" সে 'পথটি ধরিতে আমাদের অনেকবার উঁচুতে

উঠিতে ও নীচে নামিতে হইল। এই সময় আবার গাড়ীর শব্দ শ্রুত হইল। ঊর্দ্ধে চাহিয়া দেখি মাথার উপরকার একটী পাহাড়ের ধারে ধারে গাড়ী চলিয়াছে, তাহা যেন একটী "কেন্‌সুয়ের" মত দেখাইতে লাগিল।

ভয় হইল, হয়ত গাড়ী একটু বাধা পাইলে নিম্নস্থ গহ্বরে পড়িয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। আমাদের নিকট হইতে রেল লাইন প্রায় হাজার ফিট উচ্চ হইবে। এখান হইতে গাড়ীর গতি বড়ই সুন্দর মনে হইল, যেন গাড়ী একই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে; আবার কখন উচ্চে ধীরে ধীরে আরোহণ করিতেছে, ও পরক্ষণেই সেস্থান হইতে অনেক নিম্নে ও পশ্চাতে অবতরণ করিয়া ফিরিয়া আসিতেছে।

আমরা গাড়ীর গতি লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতে সুরু করিলাম। গাড়ী কখন আমাদের পশ্চাতে ফেলিতেছে, আর কখন বা আমরা গাড়ীকে পশ্চাতে রাখিয়া অগ্রসর হইতেছি। এই গাড়ী আসিতেছিল, আর নয়নগোচর হইল না। শব্দ লক্ষ্য করিয়া হাঁটিতে লাগিলাম, কিন্তু অল্পক্ষণ পরে তাহাও আর শ্রুতিগোচর হইল না। যে পথটি আমাদের দেখানো হইয়াছিল তাহাও এখানে অগণ্য পথসমুদ্রে হারাইয়া গিয়াছে। সুতরাং যে কোন একটি সরু পথে Dandy road অনুমানে উঠিতে আরম্ভ করিলাম। যখন অনেক দূর আরোহণ করিয়াছি, তখন আর পথ খুঁজিয়া পাইলাম না। এখান হইতে পর্ব্বত সরল, মসৃণ ও লম্বভাবে ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে।

এখন পাহাড়ের যে অংশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, সেখানকার একটী দৃশ্য বড় আশ্চর্য্যজনক। এখানে রেল লাইন লইয়া যাইতে ইঞ্জিনিয়ারগণকে বিশেষ কষ্ট ও শ্রমস্বীকার করিতে হইয়াছে। এইস্থানে পাহাড় বিচ্ছিন্ন হইয়া এক প্রকাণ্ড গহ্বর ও

গভীর শূন্যতা সৃষ্টি করিয়াছে; এবং এই বিচ্ছিন্নতাই পর্ব্বতকে সহস্র-বার বিভক্ত করিয়াছে, দুটী বিচ্ছিন্ন অংশের অন্তর বড় কম নয়, প্রায় পাঁচশত হস্তের অধিক। এইখানে টেলিগ্রাফের তার ঝুলিয়া পড়িয়াছে, কারণ মধ্যে কোন প্রকার অবলম্বন দিবার উপায় নাই। বোধ হয় আরোহিগণ এখানে গাড়ী হইতে নিম্নে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এখানকার পাহাড় অনেক উচ্চ। নীচের দিকে চাহিলে নিম্নস্থ কিছুই দেখা যায় না। তখন বেলা প্রায় দশটা। প্রখর সূর্য্যরশ্মি চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। নীচে তাকাইয়া আমার প্রাণ উড়িয়া গেল।

তখন বন্ধুবর আমার নিকট হইতে কোন প্রকারে তিন চারি হস্ত ঊর্দ্ধে উঠিয়া বলিলেন, "নীচের দিকে দেখিবেন না। আসুন, শীঘ্র শীঘ্র উপরে উঠিতে চেষ্টা করি, নহিলে আর কাল্‌কা ফিরিতে পারিব না; এবং ক্লান্ত হইয়া পড়িলে পথ আবিষ্কার করা অসাধ্য হইয়া উঠিবে।"

আশু বিপদের আশঙ্কায় মন অস্থির হইয়া উঠিল। মুখে কথা সরিল না। মনে হইল এখন যে পথে আসিয়াছি সে পথে ফিরিয়া যাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব।

বর্দ্ধমান রাজবাটীতে গোলকধাঁধায় যে প্রবেশ করি নাই তাহা নহে, বা তাহার জ্ঞান যে ছিল না তাহাও নহে, তবে সেখানে সারাদিন ঘুরিয়া পথ আবিষ্কার করিতে না পারিলেও মনের মধ্যে দৃঢ় বিশ্বাস থাকে, শেষে গোলকধাঁধা-রক্ষক আসিয়া বাহির করিয়া লইয়া যাইবে; কিন্তু আজ বিশ্বগোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছি। কে আসিয়া পথ দেখাইয়া দিবে? সন্ধ্যার পর ত

বাঘ ভাল্লুক আসিয়া এই অনির্দ্দিষ্ট অনাহুত শিকার দেখিলে আহারে তিলার্দ্ধ বিলম্ব করিবে না।

বন্ধুবর একটু এদিক ওদিক পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বলিল "দেখি যদি এইখান হইতে কোন উপায় করিতে পারি।" আমি সেদিকে লক্ষ্য করিয়া দেখি, তিনি একখানি বড় জোর বারো ইঞ্চি ইষ্টকের মত পাহাড়ের গাত্রে সংলগ্ন পাথর ধরিয়া পরীক্ষা করিতেছেন। বন্ধু বহু কষ্টে সেই কার্ণিসের মত পাথরের উপর উঠিয়া কোন প্রকারে উপরের পাহাড়ে আরোহণ করিলেন। আমি অকূল সমুদ্রে পড়িলাম। তাঁহার ও আমার মধ্যে একটা ব্যবধান আসিয়া পড়িল। তিনি বলিলেন "দাঁড়ান মশায়, আমি আগে দেখিয়া আসি, কোন পথ আছে কি না। শেষে কি দুইজনেই বিপদে পড়িব।" আমি নিস্তব্ধ হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। দুই তিন মিনিট অতীত হইল, তাহার কোনও সংবাদ নাই।

গভীর অন্ধকার রজনীতে পথভ্রান্ত পথিক সহসা আলো পাইলে যেরূপ উল্লসিত হয়, বন্ধুবর যখন ডাকিয়া বলিলেন "আসুন একটা পথ পাওয়া গিয়াছে" তখন আমারও অনেকটা সেইরূপ অবস্থা হইয়াছিল।

বহুকষ্টে পাহাড়ের গাত্র বহিয়া বন্ধুবরের সাহায্যে অনেকটা উপরে উঠিলাম, কিন্তু পরিধেয় বস্ত্রখানি ছিঁড়িয়া গেল, পায়ের ও হাতের তিন চারি স্থানের চর্ম্ম উঠিয়া গিয়া রক্ত নির্গত হইতে লাগিল। সর্ব্বশরীর কাঁপিল, তালু শুষ্ক হওয়াতে পিপাসায় প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হইল; আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়া পড়িলাম। নিকটবর্ত্তী একটী অল্পবিস্তৃত সমতল পাহাড়ের উপর দেখি একজন পাহাড়ী লাঙ্গল দিতেছে। এখানে এই নিত্য-অভ্যস্ত দৃশ্যটি বড়ই অভিনব দেখাইতে লাগিল। যাহা কতদিন চক্ষে পড়িয়াছে, কিন্তু

হৃদয়ের মধ্যে একটী রেখাপাতও করিতে পারে নাই, আজ এই সুদূর পার্ব্বত্য প্রদেশের নিস্তব্ধ প্রকৃতির মধ্যে তাহা যেন এক স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে বিভূষিত দেখাইতে লাগিল, তাহার দিক হইতে নয়ন ফিরাইতে ইচ্ছা হইল না।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া জলের অন্বেষণে উক্ত ব্যক্তির নিকট উপনীত হইলাম। সে আমাদের দেখিয়া লাঙ্গল হস্তে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দেখিলাম সে সামান্য একখণ্ড ভূমি কর্ষণ করিতেছে। এতদূর আসিয়াছি, কিন্তু কোথাও মৃত্তিকা দেখিতে পাই নাই! এখানে কেমন করিয়া এইটুকু ভূমি পাথর না হইয়া রহিয়াছে তাহা বুঝিলাম না। সে আমাদিগকে নিকটবর্ত্তী ঝরণা দেখাইয়া দিল। তাহার সহিত দুই একটী কথা কহিয়া অবগত হইলাম যে, অল্পদূরেই তাহার কুটীর। যে পথ দিয়া আমরা উপরে আরোহণ করিব সেই পথের পার্শ্বেই তাহার ক্ষুদ্র কুটীর পরিলক্ষিত হইবে।

সেই পথ ধরিয়া পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলাম। সে ব্যক্তি বলিল "আপনারা যে পথে আসিয়াছেন. ওপথে কেহ পাহাড়ে উঠিতে সাহস করে না।" আমাদের দুঃসাহসিকতা তাহার নিকট নির্ভীকতার পরিচায়ক হইয়া দাঁড়াইল।

অল্পদূর আসিতেই একটী ঝরণা দৃষ্টিগোচর হইল! অঞ্জলি পূরিয়া স্নিগ্ধবারি মুখে চোখে প্রদান করিলাম এবং আকণ্ঠ পান করিয়া তৃষ্ণা দূর করিলাম।

এবার পথের দিকে খুব দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে লাগিলাম, মাঝে মাঝে কোন কারণে যদি শুষ্ক পত্রের মর্মর্ শব্দ হয়, অমনি আতঙ্কে চারিদিকে চাহিয়া দেখি। আরম্ভের উৎসাহ শেষে আতঙ্কে আশঙ্কায় পরিণত হইতে লাগিল। একটী উচ্চ পর্ব্বত হইতে এইখানে পথটি

নীচু দিকে নামিয়াছে, পথ বড়ই ঢালু, খুব সন্তর্পণে পা ফেলিয়া যাইতে হয়; কোন গতিকে পদস্খলন হইলে আর নিস্তার নাই। এইখানে দুই তিন খানি ক্ষুদ্র কুটীর নয়নগোচর হইল। মনে যেন একটু আশার সঞ্চার হইল। এই কুটীরগুলির সৌন্দর্য্য এই নিরালয় পর্ব্বত-প্রদেশে যেন চিত্রকরের নিপুণ তুলিকার কোমল করুণ আঘাত বলিয়া মনে হইতেছিল। কুটীরের দ্বারদেশে দুইটী বালিকা ও একটী বালক খেলা করিতেছিল; কেহ পাথরের উপর পাথর দিয়া খেলাঘরের পর্ব্বত নির্ম্মাণ করিতেছিল, কেহ সঙ্গীর চেষ্টাকে বিফল ও খর্ব্ব করিতে অনেকগুলি বড় বড় শিলাখণ্ড সংগ্রহ করিয়া একটা বড় পাহাড় প্রস্তুতের প্রয়াস পাইতেছিল। ইহাদের খেলাতেও বিশেষত্ব আছে।

আমাদিগকে সেই বিজনপ্রদেশে আসিতে দেখিয়া তাহারা খেলা ছাড়িয়া শিলাগুলি ছড়াইয়া উঠিল। একটী বালিকা ছুটিয়া গিয়া কুটীরমধ্যে প্রবেশ করিল। হুলস্থুল ব্যাপার পড়িয়া গেল। তিন খানি কুটীর যেন চঞ্চল ও মুখর হইয়া পড়িল! রমণীরা পর্য্যন্ত ছুটিয়া কুটীরের বহির্দ্দেশে আসিয়া আমাদিগকে দেখিতে লাগিল। সেই লাঙ্গলধারী ব্যক্তির কথা মনে পড়িল। ইহার মধ্যে একখানি কুটীরই তাহার শান্তি-নিকেতন, সেখানে আসিয়া সারাদিনের ক্লান্তি-কাতর দেহভার ঢালিয়া সে বিশ্রামের আনন্দ উপভোগ করে।

একটী বালককে জিজ্ঞাসা করিলাম "ষ্টেশন কোন্ দিকে?" অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তাহাদের কুটীরের পশ্চাৎ দিক্ দিয়া যে সঙ্কীর্ণ পথটী আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে, সে তাহাই দেখাইয়া দিল। আমরা আবার চলিতে সুরু করিলাম; অনেক দূর অগ্রসর হইলাম, কিন্তু রেল লাইন বা ষ্টেশনের কোন চিহ্নই দেখিলাম না। আশঙ্কা

হইল আবার কি পথ হারাইলাম। ভয়ে নানাপ্রকার বিপদের ন মূর্ত্তিমতী হইয়া নয়নের সমক্ষে ফিরিতে লাগিল, শরীর যেন ক্রমশই শিথিল ও অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল; অথচ কোন উপায় নাই। নিকটে গ্রাম নাই, লোকালয় নাই, দোকান পসার ত দূরের কথা।

কিছুক্ষণ এইরূপ আন্দোলিত অন্তঃকরণে চলিয়াছি, সহসা বন্ধুবর চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল "ঐ ষ্টেশন দেখা গিয়াছে।" উল্লাস রাখিবার স্থান রহিল না; ছুটিয়া বন্ধুর নিকট উপস্থিত হইলাম।

দূর হইতে এই ষ্টেশনটিকে একখানি অঙ্কিত চিত্রের মত দেখাইল। খুব তাড়াতাড়ি চলিতে লাগিলাম, অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। ষ্টেশন ঘরটি কাঠের নির্ম্মিত—কপাট জানালা কাচের। গৃহের ছাদটির দুইদিক ঢালু, মধ্যখানটি উঁচু। বরফ জমিবার ভয়ে এইরূপ গৃহ প্রস্তুত হইয়াছে। কাহারও সাড়া শব্দ নাই। চারিদিকে সীমাহীন গিরিমালা, মধ্যে ষ্টেশন। কাচের ভিতর দিয়া গৃহাভ্যন্তরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেই দেখিলাম—একজন পাঞ্জাবী কর্ম্ম করিতেছেন। কাচের উপর আঙ্গুলের টোকা মারিতেই তিনি দ্বার উদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক বাহিরে আসিয়া বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে আমাদের আপাদমস্তক পর্য্যবেক্ষণ করিয়া লইলেন। ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"আপনারা দেখিতেছি বাঙ্গালী! কেমন করিয়া এখানে আসিলেন—"

"এই পাহাড়পথ অবলম্বন করিয়া আসিয়াছি। এটি কোন ষ্টেশন?"

তিনি ইহাতে অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন "গোমন"।

"টাকশাল কি ইহার আগের ষ্টেশনের নাম?"

লোকটা আরও একটু বিস্ময় প্রকাশ করিয়া উত্তর করিলেন

"আপনারা কি কাল্কা হইতে হাঁটিয়া আসিতেছেন, টাঁকশাল ত পথে ফেলিয়া আসিয়াছেন! টাঁকশাল হইতে গোমন পাঁচ মাইল দূর।"

শুনিয়া ত নির্ব্বাক্! কিছুক্ষণ পরে বলিলাম "মহাশয়, এখান হইতে কাল্কা ফিরিবার গাড়ি কখন?" তিনি উত্তর করিলেন "গাড়ি এখানে ধরে না। আসুন ঘরের মধ্যে গিয়া কথোপকথন করি, বহুদিন পরে কথা কহিবার লোক পাইয়াছি।"

বন্ধু বলিলেন "বাহিরে বেশ বাতাস বহিতেছে, এখানেই একটু বিশ্রাম করা যাক্।"

তিনি ব্যগ্রস্বরে বলিয়া উঠিলেন "না না, তাহা হইতে পারে না, এখনই বাঘ আসিতে পারে।"

"সে কি" বলিয়া আমি চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলাম, বলিলাম "এ পাহাড়ে বাঘ আছে নাকি?"

"ভিতরে বসিবেন চলুন। দেখিতে পাইবেন বাঘ ঐ নিম্নের ঝরণায় জল পান করিতে আসিবে। আমাদের ষ্টেশনে ত মাঝে মাঝে আসিয়া দরজায় জানালায় আঘাত করিয়া যায়।" তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর গিয়া উপবেশন করিলাম।

এই ভদ্রলোকটী এখানকার Asst. Station Master, তিনি আমাদের বিশেষ খাতির ও যত্ন করিলেন। ষ্টেশনমাষ্টার একজন বাঙ্গালী, একবৎসর হইল তিনি এই কর্ম্ম উপলক্ষে এখানে আছেন আমাদের আগমণবার্ত্তা যখন তিনি জানিতে পারিলেন তখন তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি তখন আহার করিতে গিয়াছিলেন। একজন pointsmanকে দিয়া তাঁহাকে ডাকিতে পাঠান হইল। অল্পক্ষণ পরেই তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন! আমাদের দেখিয়া

তাঁহার মুখের উপর আনন্দদীপ্তি ফুটিয়া উঠিল। তাঁহার মত ভদ্রলোক খুব কম দেখিয়াছি।

বাঙ্গালী ভদ্রলোকটির নাম আমি ভুলিয়া গিয়াছি। তিনি জাতিতে কায়স্থ। শুনিলাম, তাঁহার বাড়ী হুগলী জেলার মধ্যে তারকেশ্বরের নিকট হরিপাল গ্রামে। বেচারী ম্যালেরিয়ার ভয়ে দেশত্যাগী। আজ দুই বৎসর তিনি দেশে যান নাই। তাঁহার বর্ত্তমান আকৃতি দেখিলে মোটেই মনে হয় না যে, তিনি কোন দিন দুরন্ত ম্যালেরিয়ার কবলে পতিত হইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, এই দুই বৎসরে তাঁহার নূতন জীবন লাভ হইয়াছে; এক দিনের জন্যও কোনরূপ অসুখ হয় নাই, তবে স্বদেশবাসীর সহবাস হইতে বঞ্চিত আছেন বলিয়া তাঁহার দুঃখ।

বহুদিন পরে বাঙ্গালীর সঙ্গলাভ তাহার নিকট বেশ একটা অভিনবত্ব আনিয়া দিল। আমরাও অসহায় অবস্থায় তাঁহাকে দেবতার আশীর্ব্বাদের মত পাইয়া যে কি পর্য্যন্ত উল্লসিত হইয়াছিলাম তাহার স্বরূপ বর্ণনা দুরাকাঙ্ক্ষা।

দেশ যতই কুৎসিত হউক, যতই অশান্তিকর হউক, যতই অমঙ্গলকর হউক, তবুও দেশের জন্য কেমন একটা "টান" অজ্ঞাতসারে মনের মধ্যে অবস্থান করে, তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ এই প্রবাসী ভদ্রলোকের প্রতি কথায়, প্রতি প্রশ্নের মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিতেছিল। আমাদের নিবাস কোথায়, কোথায় আসিয়াছি, কয়দিন থাকিব, এখানে কেমন করিয়া আসিলাম, এ বৎসর ও দিকে ম্যালেরিয়া কিরূপ, তাঁহাদের গ্রামের কোন খবর রাখি কি না, প্রভৃতি উপর্য্যুপরি প্রশ্নমালায় তিনি আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। আমরাও যতদূর সম্ভব উত্তর দিয়া ভদ্রলোককে সুখী করিতে প্রয়াস পাইলাম।

অল্পক্ষণ পরে তিনি বলিলেন, "অপরাধ মাপ্ করবেন, আপনাদের পেয়ে এত আনন্দ হয়েছে, যে তা আর মুখে বলতে পারি না। আপনাদের আহারাদি ব্যবস্থা করবার কথা পর্য্যন্ত ভুলে গেছি।" এই বলিয়া তিনি ছুটিয়া গৃহের বাহিরে গেলেন, তার পর কি ভাবিয়া পুনরাগমন করিলেন। আজ যেন তাঁহার বহুদিনের রুদ্ধ কথার স্রোত ছুটিয়াছে, অনর্গল কথা কহাতেই আজ যেন তাঁহ্যর তৃপ্তি!

তিনি বলিলেন, "দেখুন—এখানে কিছুই পাওয়া যায় না। কোন প্রকারে একবেলা একমুঠা আলোচালের ভাত আর একবেলা খানকতক রুটী আহার ক'রে দিন কাটাচ্ছি—আপনাদের যে কি খেতে দেব তাই ভেবে অস্থির। মশাই, দুঃখের কথা কি বল্‌ব, এক পয়সার চিনির প্রয়োজন হোলে কাল্‌কায় লোক পাঠান ভিন্ন অন্য উপায় নাই।"

আমি বলিলাম "আপনি আমাদের জন্য ব্যস্ত হবেন না, আমাদের আহারাদির প্রয়োজন নাই। এখন কেমন ক'রে কাল্‌কায় ফিরে যেতে পারি তার একটা উপায় করুন। আমাদের আজই কাল্‌কায় ফেরা বিশেষ আবশ্যক।"

তিনি বলিলেন "এখানে ত গাড়ী ধরে না।"

তবে উপায়? আমার বন্ধু ত মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন।

আমার মনে দারুণ আশঙ্কা হইল। যে পথে আসিয়াছি যদি সেই পথে পুনরায় ফিরিতে হয় তবে ত ফেরার পক্ষে বিশেষ সন্দেহ। একবার ব্যাকুল দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া লইলাম। সেই নীল মেঘরাজির মত গিরিশ্রেণী; যেন মেঘ আর গিরি ছাড়া এ বিশ্ব-সংসারে আর কিছুই নাই।

তিনি আমাদের বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া বলিলেন "ভাবনা নাই।

বেলা পাঁচটার সময় একখানা গাড়ি কাল্‌কা অভিমুখে যায়, যাতে সেটা এখানে থামে, তার জন্য এখনি তার করছি।"

তারপর তিনি দুই মিনিটকাল টেবিলে বসিয়া টক্‌ টক্‌ শব্দ করিতে লাগিলেন। আমরা শঙ্কিত অন্তরে বিচারপ্রার্থী আসামীর ন্যায় নিশ্চল ভাবে উৎকর্ণ হইয়া তাঁহার প্রতি তাকাইয়া রহিলাম। যদিও সাঙ্কেতিক শব্দের মর্ম্ম আমরা বিন্দু বিসর্গ উপলব্ধি করিতে অসমর্থ, তথাপি মনে হইতেছিল এইবার যে ঘন ঘন দুইটি টক্‌ টক্‌ শব্দ হইল, উহার অর্থ "থামিবে! থামিবে!!" কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই মনে হইতেছিল—এখানে কখনও গাড়ী দাঁড়ায় না, আজ কেন আমাদের মত অজ্ঞাত সামান্য দুই জন বাঙ্গালীর জন্য থামিবে?

ঠিক এই সময় ভদ্রলোক চেয়ারখানি সজোরে পশ্চাতে ঠেলিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন "গাড়ী থামিবে, কোন চিন্তা নাই।" ইহাতে আমাদের অপেক্ষা তাঁহার যেন অধিক আনন্দ হইল। তিনি আবার বলিলেন "বড় কষ্ট যে, আপনাদের পাইয়া কোনরূপ সমাদর বা অভ্যর্থনা করা দূরে থাক, ক্ষুধা নিবৃত্তির মত এমন কিছুই নাই যাহা দিতে পারি।" আমরা তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিলাম "সে জন্য কিছু মনে করিবেন না। আপনার আগ্রহের মধ্যে যে অভ্যর্থনা ও যত্ন তাহার তুলনায় খাওয়া বড় বেশী ব'লে মনে হয় না।" তবু সে কথা ভাবিয়া তিনি অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। আমরা আহারাদির প্রতি অমনোযোগিতা প্রকাশ করিয়া গাড়ী কখন আসিবে, এই প্রশ্ন করিতেছিলাম তিনি বলিলেন "সে জন্য কোন ভাবনা নাই।" দুর্ভাবনার হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়া, স্নান করিবার বাসনা জাগিয়া উঠিল।

যতক্ষণ কেমন করিয়া কাল্‌কা ফিরিব এই চিন্তা মনে ছিল, ততক্ষণ স্নানাহারের কথা কিছুই মনে স্থান পায় নাই। স্নানের কথা শুনিয়া ভদ্রলোক বলিলেন "জল আনাইয়া দিতেছি, এখানেই স্নান করুন, ঝরণার কাছে এখন আর গিয়ে কাজ নাই।"

"ঝরণা এখান হ'তে কতদূর।"

"বেশী দূর নয়; নিকটেই—ঐ নিম্নের পাহাড়ে। জল অতি স্বচ্ছ ও নির্ম্মল। এরূপ জল শুনিয়াছি এ অঞ্চলে কোথাও নাই।"

Pointsman, পোর্টার প্রভৃতি দুই তিন জন লোককে লইয়া তিনি নিজে আমাকে স্নান করাইতে লইয়া চলিলেন। জল অত্যন্ত স্নিগ্ধ ও স্ফটিকের মত স্বচ্ছ। তারপর তিনি বাসা হইতে খানিকটা চিনি আনাইয়া সরবত প্রস্তুত করিয়া দিলেন। উহা পান করিয়া বিশেষ তৃপ্তি অনুভব করিলাম।

স্নানান্তে যখন আমরা ষ্টেশনের বারাণ্ডায় একখানি খাটিয়ার উপর বসিয়া গল্প করিতেছি, তখন মাঝে মাঝে সচকিত দৃষ্টিতে চতুর্দ্দিক দেখিতেছিলাম, পাছে সেই ভয়ানক জন্তুটি কখন কোন্ দিক দিয়া আসিয়া টপ্ করিয়া আমাকে তুলিয়া লইয়া যায়।

এমন সময় দেখি সম্মুখস্থ পাহাড় হইতে সেই পাঞ্জাবী ভদ্রলোক কতকগুলি জ্বালানি কাঠ মাথায় করিয়া ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতেছেন। তাঁহার হস্তে একখানি কুড়ুল। আমাদের নিকটবর্ত্তী হইয়া তিনি মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন; খুব কাছাকাছি আসিয়া বলিলেন—

"আপনারা নিশ্চয়ই আমাকে অসভ্য জঙ্গলী বিবেচনা কর্‌ছেন। আপনাদের দেশে কোন ভদ্রলোক এরূপ ভাবে বোঝা মাথায় করিয়া কখন আনেন না, বা আনিতে পারেন না।"

আমরা বলিলাম "না না, ও কথা বল্‌বেন না, নিজের কাজ নিজে করি না বলেই ত আমাদের এত অবনতি, এত অধঃপতন হ'য়েছে।"

এই পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটীর মুখে সদাসর্ব্বদা হাসি লাগিয়াই আছে। তিনি উত্তর করিলেন, "দেখুন, এখানে দোকান-পসার নেই, লোকজন নেই, নিজে কাঠ সংগ্রহ না করলে কে ক'রে দিবে বলুন? Points-man, পোর্টার বাঘের ভয়ে কেহ উঁচু পাহাড়ে গিয়া কাঠ কাটিতে সাহস করে না। আমি তাহাদের বলিতেও ইচ্ছা করি না।"

তিনি কাঠের বোঝাটি মাথায় করিয়া হাসিতে হাসিতে আমাদের সহিত কথা কহিতেছিলেন, যেন তাঁহার কোন রূপ কষ্ট বা ভার বোধ হয় নাই। তাঁহার সেই সরল সহজ শান্ত দৃষ্টিতে বিপুল মনের বল প্রকাশ পাইতেছিল; তাঁহার কথাবার্ত্তায়, হাসিতে, চাহনিতে বেশ কেমন একটা মনুষ্যত্বের নিরহঙ্কার ভাব আমাদের সঙ্কীর্ণ সভ্যতাভিমানী মনের উপর তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিতেছিল।

আমরা বেশ গম্ভীর ভাবে উত্তর করিলাম "ইহাতে লজ্জার কথা কিছুই নাই। বরং গৌরব করিবার কথা—বাঘের মুখ হ'তে কাঠ কাটিয়া আনেন।"

তিনি বলিলেন, "এখনি আপনাদের নিকট আস্‌ছি, কাঠগুলি দিয়া আসি, নইলে হয় ত রন্ধন বন্ধ যাবে, কিছু মনে কর্‌বেন না।"

দুই তিন মিনিটের মধ্যেই তিনি হাসিতে হাসিতে ফিরিয়া আসিলেন। এই সময় আমি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক কতকগুলি গিরিস্তরের পর একটী গগনস্পর্শী গিরিশিরস্থ শুভ্রস্তূপ দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "উহা কি?"

তিনি ভক্তিপরিপূর্ণ স্বরে কহিলেন,—"দেবীর মন্দির"।

এই নিরালয় নির্জ্জন পর্ব্বতপ্রদেশের মধ্যে কে দেবীর প্রতিষ্ঠা করিল! কে ঐ মানব-আবাস-পরিশূন্য ব্যাঘ্র-ভল্লুক-ভয়-সঙ্কুল স্থানে পূজার্থে দেবীর মন্দির নির্ম্মাণ করাইল! কত কথাই মনে আসিতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে বেশ একটী ভক্তির অনাবিল স্রোত হৃদয়ের পরতে পরতে প্রবাহিত হইতে লাগিল।

আমরা তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম "বলুন, আমাদিগকে দেবী দর্শন করাইয়া আনিবেন।"

তিনি বলিলেন "কিছু দিন তবে এখানে থাকুন, এক দিনে ত যাওয়া যাবে না। যদি দুই একটী সাধু সন্ন্যাসীর দর্শন লাভ হয় তবে যাওয়া যায়, আমি ত পথ চিনি না।"

"ওখানে কারা থাকে?"

"তাহারা পার্ব্বত্য জাতি, নীচে বড় আসে না। তাহাদের অভাব ওখানেই পূরণ হয়; নীচের কোন সংবাদ বোধ হয় তারা জানেনা।"

ষ্টেশনমাষ্টার বলিলেন, "বলেন কি, ও যে শুনেছি দুই দিনের পথ। তার পর বাঘভালুকের হাত থেকে নিস্তার পেলে ত দেবী; দর্শন আমার মাথায় থাকুক, আমি এখান হ'তেই আজ দুই বৎসর তাঁকে প্রণাম করে আস্‌ছি। ধন্য আপনাদের সাহস।" পাঞ্জাবী হাসিয়া বলিলেন "সত্যই ঐখানে পৌঁছিতে দুই দিন লাগে, এখান হ'তে অনেক দূর, তারপর পাহাড়ের পথ চিনিয়া যাওয়া বড় কঠিন ব্যাপার।"

আমি বলিলাম "যাঁহারা পর্ব্বতে বাস করেন, তাঁহাদের নিকট আর শক্ত কি?"

"না মহাশয় ও কথা বল্‌বেন না। আমার জন্ম এই পাহাড়ে, আমার চাকরীও এই পাহাড়ে, তথাপি আজ জোর ক'রে বল্‌তে পারি

না যে, পাহাড়ের যতটুকু স্থান আমার জানা আছে, তাহার পথগুলি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে পেরেছি। দেখুন না কেন, আজ খানিক পূর্ব্বে এই সামনের পাহাড়ে এক বোঝা কাঠ কেটে রেখে এসেছিলাম, কিন্তু আনতে গিয়ে আর খুঁজে পাইনি। এখানে অন্য কেহ নাই, যে মনে করবেন, কাঠগুলি আর কেহ চুরি করে নিয়ে গেছে। এই পথটি ভালো ক'রে জানা আছে, এ গর্ব্ব করবার কারো যো নাই।"

এই স্থান হইতেই আমরা দেবীর উদ্দেশে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনি কুড়ুল নিয়ে আবার কোথায় যাচ্ছেন!" তিনি বলিলেন "আরো কতকগুলি কাঠ কেটে রেখে আসতে। আপনারা কি আমার সঙ্গে উপরের পাহাড়ে উঠিবেন। চলুন না, বেশ সুন্দর একটী ঝরণা আছে দেখ্‌বেন, নানা ফলের ও ফুলের গাছ আছে, কেমন পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন অসংখ্য পথ।"

তখন দুই বন্ধুতে পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করিলাম। তারপর ষ্টেশনমাষ্টারের প্রতি সোৎসুক দৃষ্টিতে তাকাইলাম, তিনি বলিলেন, "গাড়ি আসতে অনেক বিলম্ব আছে। দেখেই আসুন না কেন।"

আমাদের অগ্রে অগ্রে পাঞ্জাবী কুড়ুল হস্তে, দুরন্ত বালকের মত সেই উঁচু নীচু পথ অবলম্বনে বেশ সহজে ছুটিয়া উঠিতে সুরু করিলেন। আমরা তাঁহার অনুসরণ করিয়া কেবলই পিছাইয়া পড়িতেছি দেখিয়া, তিনি মাঝে মাঝে দাঁড়ান, আর জিজ্ঞাসা করেন "বড় কষ্ট হচ্ছে কি? ধীরে ধীরে উঠিলে শীঘ্রই ক্লান্ত হয়ে পড়বেন, আমার মত ছুটিয়া ছুটিয়া উঠুন বেশ আমোদ পাবেন, কোন কষ্ট হবে না।"

আমরা তাহাই করিতে লাগিলাম; তবে আশঙ্কা যথেষ্ট হইতেছিল, পাছে পড়িয়া যাই।

চারিদিকে কেবল পথ, আর জঙ্গল! যতই উপরে উঠিতেছি, ততই মনে হইতেছে আমরা যে পর্ব্বতে ছিলাম, সেইখানেই আছি। পাহাড়গুলি যেন যমজ ভ্রাতা। একটীকে দেখিয়া অপরটিকে ভ্রম হয়। পাহাড়ের উপর নানা জাতীয় বৃক্ষলতা, কোথাও বৃক্ষে পরিপূর্ণ ফুল হইয়াছে, কোথাও টেপারির মত একজাতীয় ফল মুক্তার ন্যায় রৌদ্রকিরণে ঝিকিমিকি করিতেছে—কোথাও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে নাসপাতি ফলিয়া রহিয়াছে, কোথাও বা ঝরণার তুষারশীতল, স্ফটিকস্বচ্ছ বারিরাশি ঝর ঝর করিয়া চলিয়াছে, কোনো কোনো স্থানে বিবিধজাতীয় পার্ব্বত্য কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া আছে, থাকিয়া থাকিয়া নানা বিহগের কূজন শ্রুতিগোচর হইতেছে—আমরা মুগ্ধ হৃদয়ে এই সৌন্দর্য্য-বন্যায় ভাসিয়া চলিয়াছি—আনন্দে হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়াছে। তখন পাঞ্জাবী আমাদের প্রতি ভক্তি-উজ্জ্বল-নয়নে তাকাইয়া বলিলেন "বলুন ত মহাশয়, এ সব কাহাদের জন্য রহিয়াছে? এত ফুল অরণ্যে ফুটিয়া অরণ্যেই ঝরিয়া যাইতেছে—এত ফল অকারণ শুকাইয়া নষ্ট হইতেছে, ইহার কি কোন সার্থকতা নাই? অবশ্য আছে—বিশ্বনিয়ন্তার প্রেমের রাজ্যে অপ্রেমের কিছুই নাই। দেখুন না কেন, পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে তরুলতা, কণ্টক বৃক্ষ, কিন্তু এই সকল সঙ্কীর্ণ পথগুলির উপর এক গাছিও কণ্টক দৃষ্ট হইতেছে না। কেহ যেন প্রতিদিন পথগুলির তত্ত্বাবধান করিয়া থাকে। যেখানে মনুষ্যসমাগম নাই সেখানকার রাস্তা কাহাদের জন্য পরিষ্কার রহিয়াছে। কাহারা এই ভয়সঙ্কুল পথে হাঁটিয়া থাকেন।" বলিতে বলিতে তাঁহার স্বর ভক্তি গদ্‌গদ্ হইয়া পড়িল। নয়ন পুলকাশ্রুসিক্ত হইল। তিনি নতজানু হইয়া সেই পথের উপর ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। তাহার পর বলিলেন "আমার মনে হয়, এই পথ দিয়া সা

সন্ন্যাসী গমনাগমন করিয়া থাকেন। পাছে তাঁহাদের চরণে কণ্টক বিদ্ধ হয়, পাছে তাঁহাদের চলিতে কষ্ট হয়, তাই দয়াল ঠাকুর এই নির্জ্জন পর্ব্বতের পথগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিয়াছেন, তাই তাঁহাদের ক্ষুধা নিবৃত্তির নিমিত্ত সুমিষ্ট ফল স্তরে স্তরে সাজাইয়া রাখিয়াছেন।"

এইবার তিনি আর একটা সঙ্কীর্ণ পথ অবলম্বন করিলেন। অল্প দূর অগ্রসর হইবার পর সে পথে পাশাপাশি যাওয়া চলিল না। পথ ক্রমেই অল্পপরিসর হইয়া আসিল। তখন পাঞ্জাবী সর্ব্বাগ্রে রহিলেন, তাঁহার পশ্চাতে আমি ও আমার পশ্চাতে 'উপেন সাহেব।' এইবার যে স্থানটিতে উপস্থিত হইলাম সেখান হইতে নিম্নে দৃষ্টিপাত করিলে মস্তক ঘুরিতে থাকে—আশঙ্কায় বক্ষের শোণিত শুষ্ক হইয়া আসে। চারিদিকে কেবল পাহাড়—এই গিরীশ্রেণীর শেষ নাই, সীমা নাই, সেখান হইতে পাহাড় ঢালুভাবে নীচের দিকে নামিয়া গিয়াছে; নিম্নস্থ বৃক্ষলতাদি বেশ সুস্পষ্ট দেখা যায় না। পাঞ্জাবী নিম্নের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইলেন, ঐ যে রৌদ্র-কিরণোজ্জ্বল শুভ্র-রজত-সূত্রের মত একটী বক্র রেখা দেখিতে পাইতেছেন—উহা একটী গিরি-নির্ঝরিণী। অল্পক্ষণ এখানে দাঁড়াইলে দেখিতে পাইবেন উহার তীরে নানা জাতীয় জন্তু আসিয়া জলপান করিবে। ঐ নদীর ধারে অনেক সময় সাধু সন্ন্যাসীর দর্শন পাওয়া যায়—তাঁহারা স্নানাদি করিতে আগমন করেন। তখন চারিদিক হইতে বিহঙ্গ কূজন ও নানাবিধ অজ্ঞাত পুষ্পের গন্ধে চারিদিক মাতিয়া উঠিয়াছিল। মনের ভিতর যেন একটা অজানা আনন্দের বন্যা বহিতেছিল; মনে হইতেছিল চারিদিকের শোভা সৌন্দর্য্যের মধ্যে যেন আত্মহারা হইতেছি—সুখ বুঝি ইহারই নাম; কবির কথা মনে জাগিয়া উঠে—

"তরী হতে সম্মুখেতে দেখি দুই পার ;
স্বচ্ছতম নীলাভ্রের নির্ম্মল বিস্তার ;
মধ্যাহ্ন আলোকপ্লাবে জল স্থলে বনে
বিচিত্র বর্ণের রেখা ; আতপ্ত পবনে
তীর-উপবন হতে কভু আসে বহি'
আম্রমুকুলের গন্ধ, কভু রহি' রহি'
বিহঙ্গের শ্রান্ত স্বর।

* * * * *

বিশ্ব-বীণা হতে উঠি' গানের মতন
রেখেছে নিমগ্ন করি নিথর গগন ;
সে সঙ্গীত কি ছন্দে গাঁথিব ; কি করিয়া
শুনাইব, কি সহজ ভাষায় ধরিয়া
দিব তারে উপহার ভালবাসি যারে,
রেখে দিব ফুটাইয়া কি হাসি আকারে
নয়নে অধরে, কি প্রেমে জীবনে তারে
করিব বিকাশ ?' সহজ আনন্দ খানি
কেমনে সহজে তারে তুলে ঘরে আনি
প্রফুল্ল সরস ?

* * * * *

চারিদিকে
দেখে' আজি পূর্ণ প্রাণে মুগ্ধ অনিমিষে
এই স্তব্ধ নীলাম্বর স্থির শান্ত জল,
মনে হ'ল সুখ অতি সহজ সরল।

ভক্তের চক্ষে সকলি সুন্দর! সকলি অপার্থিব! পাঞ্জাবীর সেই

ভক্তি-উজ্জ্বল নয়ন, আনন্দদীপ্ত আনন, সুমিষ্ট বচন, আজও আমরা ভুলিতে পারি নাই।

পাহাড়ের নানাস্থান প্রদর্শন করাইয়া শেষে গাড়ীর শব্দ শুনিলে আমাদের লইয়া তিনি নামিয়া নীচে আসিলেন। গাড়ী আমাদের জন্য গোমনে ধরিল। বেলা সাড়ে ছয়টার সময় তাঁহাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া কালকায় ফিরিলাম।

যখন গোমন হইতে গাড়ী ছাড়ে তখন বাঙ্গালী ভদ্রলোকটির মুখ বিষণ্ণ হইয়া গেল। তিনি পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেন "পত্র লিখিবেন।" আমরা যেন তাঁহার কতই পরিচিত, কতই আপনার জন। সঙ্গীতের শেষ রেশের ন্যায় সেই ভক্ত পাঞ্জাবীর কথাগুলি আজও যেন কাণের কাছে ধ্বনিত হইতে থাকে—"ভগবানের রাজ্য দেখিয়া গেলেন, বন্ধু বান্ধবদিগের নিকট তাঁহার অপরিসীম দয়ার কথা বলিতে বিস্মৃত হইবেন না।" আজ যতদূর সাধ্য তাহারই বর্ণনা করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম।

বালেশ্বরে আট দিন।

সারাদিন যাত্রার যোগাড় চলিতেছে। বিছানাপত্র হইতে আরম্ভ করিয়া কুচান সুপারী পর্য্যন্ত ট্রাঙ্কে ভরা হইয়াছে। দশ দিনের ছুটিতে বেড়াইতে যাওয়া হইবে বলিয়াই এই বিপুল আয়োজন।

সন্ধ্যার ক্ষণপূর্ব্বে গৃহিণী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কোথায় যাওয়া স্থির হইল?" আমি তখন ভাবিতেছিলাম হয় ত যাহা লওয়া বিশেষ আবশ্যক ছিল তাহা গ্রহণ করা হয় নাই, আর যাহা মোটেই না লইলে চলিত, তাহাই বিশেষ যত্নের সহিত গ্রহণ করিয়াছি।

গৃহিণীর মুখের দিকে না চাহিয়াই উত্তর করিলাম "এখনো কিছু ঠিক করিতে পারি নাই, দেখা যাক্ কোথায় গিয়া ঠেকি।"

সন্ধ্যার অল্প পরেই সঙ্গী মণিবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি একেবারে গাড়ী করিয়া আসিয়াছিলেন। আশ্বিন মাস। সমস্ত দিন গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হইতেছিল। তাহাতে উৎসাহ কতকটা মন্দীভূত হইয়াছিল।

গাড়ীতে উঠিয়াই মণিবাবু বলিলেন "তারপর কোথায় যাওয়া স্থির করিলেন?" আমি বলিলাম "কোন জায়গা ত মনোনীত করিতে পারি নাই, আপনি একটা ঠিক করুন।"

আমাদের সঙ্গে দুইখানি Time table ছিল, একখানি B. N. Ry.,র অপর খানি E. I. Ry.র; কারণ কোথায় যাওয়া হইবে, তাহার স্থিরতা ছিল না। নানা কথা ভাবিতেছি এমন সময় গাড়ী হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্ল্যাট্‌ফরমে নামিয়া দেখি একখানি ট্রেন ছাড়িবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে। তখন নূতন ষ্টেশন নির্ম্মিত হয় নাই—পুরাতনের আদর পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত। দুই লাইনের গাড়ী তখন এক ষ্টেশন হইতে ছাড়িত।

অনুসন্ধানে জানিলাম, গাড়ী পুরীর জন্য রওনা হইবে। তাড়াতাড়ি স্থির হইল যেখানে গিয়া প্রভাত হইবে, সেই স্থানের টিকিট ক্রয় করিব।

অতঃপর বালেশ্বরের দুইখানি টিকিট ক্রয় করা হইল। আমাদের আগ্রহ, উৎসাহ ও তৎপরতা অপেক্ষা রেলের কুলিগুলির তাড়া বেশী দেখিলাম।

তাহারা আমাদের গাড়ীতে চড়াইয়া দুই পয়সার স্থানে চারি আনা আদায় করিয়া অন্য শিকার অন্বেষণে ছুটিল। আমরা যে গাড়ীতে যাত্রা করিলাম সেখানি Madras মেল। গাড়ী বংশীধ্বনি করিয়া ছাড়িয়া দিল। তৃতীয় শ্রেণীর আরোহীগণ সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল,—"জয় জগন্নাথ প্রভু কি জয়!"

আমরা যে বৎসর যাই, তাহার দুই বৎসর পূর্ব্বে এই লাইন খোলা হইয়াছে। বন্ধু বিছানা-পত্র পাতিয়া সব ঠিক ঠাক্ করিয়া লইলেন। আমি একটী জানালার ধারে গিয়া উপবেশন করিলাম। এ পথে ইহার পূর্ব্বে আর কখন আসি নাই, সুতরাং আমার আনন্দ ও আগ্রহ প্রথম হইতে বেশ পরিলক্ষিত হইতেছিল। মণিবাবুর মেদিনীপুর পর্য্যন্ত দেখা ছিল, তিনি অপর একটী মেদিনীপুর যাত্রী আরোহীর সহিত তাঁহার মেদিনীপুর সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লইয়া বেশ আসর জমকাইতে ছিলেন।

অল্পক্ষণ পরেই গাড়ী দুরন্ত দামোদরের পোল অতিক্রম করিল! যে দামোদরের খরস্রোতে একটি কুটা পড়িলে একদিন দ্বিখণ্ডিত হইয়া যাইত, আজ তাহার বন্ধন-দশা অবলোকন করিয়া নানা কথা মনে পড়িল। দামোদর নদের উপরকার পোলটী প্রায় দীর্ঘে অর্দ্ধ মাইল বিস্তৃত হইবে।

অল্পক্ষণ পরেই গাড়ীর গতি কিছু হ্রাস হইল। মুখ বাড়াইয়া

ব্যাপার কি দেখিতেছি এমন সময় সঙ্গী বন্ধু বলিলেন "দেখিতেছি তুমি আজ সারারাত্রি ঘুমাইবে না ঘুমাইতেও দিবে না, এখানে লিপিবদ্ধ করিবার কিছু নাই ; বরং এইবার রূপনারায়ণের পোল আসিতেছে ; এটী অবশ্য দেখিবার মত !" তারপর গাড়ি রূপনারায়ণের পোলের উপর উঠিল—গম্ গম্ শব্দে গাড়ি ছুটিয়া চলিয়াছে—নিম্নে শৃঙ্খলাবদ্ধ নদী পড়িয়া রহিয়াছে—বাঁধন ভাঙ্গিবার জন্য সুদৃঢ় স্তম্ভগুলির গাত্রে বৃথা তরঙ্গাঘাত করিতেছে। প্রতিহত তরঙ্গাঘাতের শব্দ জলকল্লোলের সহিত শুনা যাইতেছিল।

রূপনারায়ণের পরপারেই কোলাঘাট। এই স্থানে অবতীর্ণ হইয়া ষ্টীমার করিয়া তমলুক যাইতে হয়। এই জন্য মেল এই সামান্য ষ্টেশনে থামে। গাড়ি থামিলে অনেকগুলি যাত্রী অবতরণ করিল। 'ডাব চাই' 'মুড়ি বাবু, গরম মুড়ি চাই' বলিয়া বিক্রেতা গাড়ীর কাছে ডাকিয়া গেল। সেই রাত্রে অনেকে পথের আহার্য্য স্বরূপ তাহাই গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন !

ই, আই, রেলের ষ্টেশনগুলিকে আমি বড় ভালবাসি। দিন নাই, দুপুর নাই, রাত্রি নাই, সন্ধ্যা নাই, শীত নাই, গ্রীষ্ম নাই, বর্ষা নাই— সব সময় সেই এক বনিয়াদি চাল "চাই পুরী-মেঠাই, মালাই, গরম দুধ—আপেল, পেয়ারা—নাসপাতি, চা।" শুনিতে বেশ লাগে।

খড়্গপুর একটী প্রকাণ্ড ষ্টেশন ; এইখান হইতে নাগপুর, পুরুলিয়া, মেদিনীপুরের জন্য গাড়ী বদল করিতে হয়। ষ্টেশনটি বৈদ্যুতিক আলোকমালায় সুশোভিত। নানা দিক হইতে যাত্রী আসিয়া নানা দিকে চলিয়াছে। সে এক বিরাট ব্যাপার ; সকলেই নিজ নিজ দ্রব্যাদি ঘাড়ে, পিটে ও কুলীর মাথায় দিয়া ছুটাছুটি করিতেছে। কেহ বা ছুটিয়া আসিয়া পুরী-যাত্রী আরোহীদের ব্যাকুলস্বরে জিজ্ঞাসা

করিতেছে "মহাশয়, এই গাড়ী কি কলিকাতা যাইবে?" কেহ বা সঙ্গী হারাইয়া পাগলের মত হাঁকাহাঁকি জুড়িয়া দিয়াছে; কোথাও বা কাপড়ে গাঁট-ছড়া বাঁধিয়া একদল স্ত্রীলোক, মাত্র একটী নিরীহ পুরুষের তত্ত্বাবধানে গাড়ীর অন্বেষণে, একবার এদিক, একবার ওদিক করিয়া বেড়াইতেছে। তাহারা যেন কলের পুতুলের মত নড়িতেছে, ফিরিতেছে। তাহাদের রক্ষক ও পথপ্রদর্শকও সেইরূপ। টিকিট কলেক্টার, কুলী, রেলওয়ের কর্ম্মচারিবর্গ প্রবল প্রতাপে, গর্ব্বিত-বক্ষে চলা-ফেরা করিতেছে। তাহারা যেন দেবতা, অনেক সাধ্য সাধনার পর যদি ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয় তবে শত প্রশ্নের পর একটী উত্তর দিয়া থাকেন। চারিদিকে গোলমাল; কোথাও কাহার টিকিট সহযাত্রীর নিকট ছিল, কিন্তু সে ভিড়ের মধ্যে কোথায় মিশিয়া যাওয়ায় টিকিট দেখাইতে পারিতেছে না বলিয়া পুলিসের হস্তে অর্পণ করিবার ভয় প্রদর্শিত হইতেছে, সে আকুল অন্তরে সহযাত্রীকে ডাকিতেছে এবং সে যে টিকিট কিনিয়াছিল এই সত্যের সমর্থনের জন্য আস-পাশের যাত্রীর সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছে। এইখানে গাড়ী অর্দ্ধঘণ্টা অপেক্ষা করে। মেদিনীপুর-যাত্রী ভদ্রলোকটী আমাদের ফিরিবার সময় বিরাট রাজার গো-গৃহ দেখিবার নিমন্ত্রণ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

ইহার পর মাঝে একটু বেশ নিদ্রা হইয়াছিল। পথে অন্য কিছু দেখিবার অবসর হয় নাই।

ভোরের সময় গাড়ি বালেশ্বরে গিয়া পৌঁছিল। তখনও উষার আলো অরুণবর্ণে রঞ্জিত হয় নাই। তাড়াতাড়ি গাড়ি হইতে অবতরণ করিলাম। বেশ একটু শীত শীত করিতে লাগিল। চারিদিকে চাহিয়া দেখি কুয়াসার অবগুণ্ঠন টানিয়া প্রকৃতি

সতী যেন কাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। অদূরে পর্ব্বতশ্রেণী, নিবিড় নীরবতার মধ্যে স্তব্ধ ও স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। বালেশ্বর ষ্টেশন হইতে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে, প্রাণের ভিতরে বেশ একটু আনন্দের সঞ্চার হয়। চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত মুক্ত প্রান্তরভূমি—অদূরে নীলগিরি। মাঝে মাঝে গাড়ীর বংশীধ্বনি সেই বিপুল নিস্তব্ধতার উপর কেমন এক মধুর ঝঙ্কার আনিয়া পুলক সঞ্চার করে। যখন ষ্টেশন হইতে যাত্রীরা যে যাহার গন্তব্য স্থানে প্রস্থান করিল, কেবল রেলওয়ে কর্ম্মচারী ও কেলনার কোম্পানীর খান্‌সামাগণ 'পিরিচ পেয়ালা' লইয়া ছুটাছুটি শেষ করিয়া প্লাটফরমে পা ছড়াইয়া বসিয়া ধূমপানে কর্ম্মক্লান্তি দূর করিতে লাগিল, তখন কোথায় যাইব, সেই চিন্তায় আমরা বিব্রত। একটা উড়িয়া আমাদের মোটগুলি বহন করিবার অনুমতি প্রার্থনায় বিস্তর উমেদারী করিতেছিল। আমরা যতই তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলাম "তোকেই দিব, তুই বোস্" সে ততই অধীর হইয়া পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল "কোথায় যেতে হবে? মহেন্দ্রবাবু উকিলের বাসায়?"

সেখানে কোন উকিলই আমাদের পরিচিত ছিল না। সুতরাং তাহার কথায় আমার বড় রাগ হইল, শেষে বলিলাম "চল্ তোর মহেন্দ্রবাবু উকিলের বাসায় যাই।" বন্ধু শুনিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন, বলিলেন "সেই ভাল।"

উড়িয়া ইহাতে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া ভীতি-কাতর দৃষ্টিতে একবার আমার ও বন্ধুবরের মুখের প্রতি তাকাইতে লাগিল। এই সময় বেশ একটী উপন্যাসের মতন ঘটনা সংঘটিত হইল। একটী ভদ্রলোক সেইখানে তাড়াতাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তিনি চারিদিকে চাহিয়া কাহার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। এই

গাড়ীতে কাহারও আসিবার কথা ছিল, যেন তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যাইতে আসিয়াছেন বোধ হইল। আমরা মনে মনে করিতেছি যে, ইহার নিকট হইতে একটী বাসার সন্ধান করিয়া লইতে হইবে, এমন সময়ে তিনি আসিয়া প্রশ্ন করিলেন "মহাশয় দেখিয়াছেন কি, দুইজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক আরোহী এই গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়াছে?" "আজ্ঞে না আমরা দুই জন ভিন্ন অন্য কোন বাঙ্গালীকে গাড়ী হইতে অবতরণ করিতে দেখি নাই।" বলিয়া আমি হাসিয়া ফেলিলাম, কারণ এই আগন্তুক অন্য কেহ নয়, আমার সহপাঠী প্রসন্ন। প্রসন্ন তাড়াতাড়ি আগ্রহভরে আমার হাত, তাহার হাতের উপর টানিয়া লইয়া বলিল "মন্দ নয় তুমি এখানে? কত দিন?" "এখনও দিন হয় নাই, ভোরেই আছি"—তারপর আমাদের অভিযান-ইতিহাস শ্রবণ করিয়া বলিল "বেশ হইয়াছে এখন বাসায় চল।"

আমি বলিলাম "ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান্‌ বয়।"

উড়িয়া কুলিটি আমাদের একটা কিনারা হইল অবলোকন করিয়া ভারি খুসী হইল। ইঙ্গিত করিতেই সে সমস্ত দ্রব্যাদি গ্রহণ করিয়া আমাদের সঙ্গে চলিল।

বালেশ্বর ষ্টেশন হইতে অল্প দূরেই নূতন বাজার—এইখানে প্রসন্ন বাসা লইয়াছে। তাহারা বায়ু পরিবর্ত্তন করিতে দুই সপ্তাহ হইল আসিয়াছে।

আহারাদির পর আমরা সহর দেখিতে বাহির হইলাম। এখানকার রাস্তা ঘাট বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। অনেকগুলি বাজার আছে। সহরটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ কম নয়। বালেশ্বর কলিকাতা হইতে ১৪৪ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানকার সকল অধিবাসীই উড়িয়া, কিন্তু

তাহাদের চাল-চলন অনেকটা বাঙ্গালীর মত হইয়া পড়িয়াছে। বেশীর ভাগ লোক গরীব। ইহাদের অনেকেই খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী। এখানকার আদালত গৃহটী দেখিতে বড় সুন্দর, সম্মুখে একটী বিস্তৃত ময়দান। বড় বড় অশ্বত্থবৃক্ষরাজি চারিদিকে বেষ্টন করিয়া আছে। অদূরেই স্কুল। ম্যাজিষ্ট্রেটের আবাস গৃহটি বেশ সুরম্য। এখানে ইংরেজদের দুইটি উপাসনা-মন্দির আছে—একটী রোমান কেথলিক্ ও অপরটি ব্যাপ্‌টিষ্ট।

বালেশ্বরের জলবায়ু বেশ স্বাস্থ্যকর। এখান হইতে সমুদ্র আট মাইল দূরে। সমস্ত দিন ঘুরিয়া অবসন্ন-দেহে ছয়টার সময় বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। এখানে চাউল বেশ সস্তা। নানাবিধ মৎস্য খুব সামান্য মূল্যে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

ঝাড়েশ্বর শিব।

ঝাড়েশ্বরের মন্দির ষ্টেশন হইতে দশ মিনিটের পথ। এই মন্দির-স্থিত লিঙ্গসংক্রান্ত নানাবিধ কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন মহাদেব ঝাড়েশ্বর কাহারও প্রতিষ্ঠিত নন। তিনি পাতাল হইতে স্বয়ং উঠিয়াছেন। আমরা ঝাড়েশ্বর দর্শন করিবার জন্য বেলা সাতটার সময় বাসা হইতে বাহির হইলাম।

মন্দিরটী ইষ্টক-নির্ম্মিত ও প্রাচীন বলিয়া অনুমিত হয়। পরিসরে ইহা নিতান্ত ক্ষুদ্র নয়। মন্দিরের সম্মুখে একটী বৃহৎ পুষ্করিণী ইষ্টক-নির্ম্মিত সোপানাবলী দ্বারা পরিশোভিত, কিন্তু সংস্কারাভাবে নানাস্থান কালের কঠোর আঘাতে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গিয়াছে ও যাইতেছে। মন্দিরের সংলগ্ন নাটমন্দির যে এক সময় বেশ সুন্দর ও মনোরম ছিল তাহা তাহার ভগ্নাবশেষ দেখিয়া উপলব্ধি করা যায়। মন্দিরপ্রাঙ্গণের চতুঃসীমা প্রাচীরবেষ্টিত ছিল, তবে অনেক স্থানে প্রাচীরের ক্ষীণ রেখা

মাত্র অতীতের সাক্ষ্য স্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে। এই মন্দিরসংস্কার সম্বন্ধে কোন প্রকার উৎসাহ, অয়োজন বা চেষ্টা দেখিলাম না। নাটমন্দিরের নিকট দুই চারিটি গৃহ ভগ্নাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। ঐগুলি পূর্ব্বে ঠাকুরের ভাঁড়ার ও অতিথি অভ্যাগতের বাসগৃহরূপে ব্যবহৃত হইত। মন্দির-প্রাঙ্গণের মধ্যেই পুরাতন অশ্বথ, বকুল, আমলকী প্রভৃতি বৃক্ষ এখনও বিদ্যমান আছে, তাহাদের সহিত যেন অতীতের অনেক পুরাতন গৌরবকাহিনী বিজড়িত রহিয়াছে। তাহারা একদিন ঝাড়েশ্বরের পূজা-অর্চ্চনার সুখ-সমৃদ্ধি অবলোকন করিয়াছে, শত শত প্রার্থীর প্রার্থনা পূর্ণ হইতে দেখিয়াছে, কিন্তু এক্ষণে কালের নিদারুণ পরিবর্ত্তনে তাহারা বিস্মিত ও স্তম্ভিত। দুই একজন সাধু-সন্ন্যাসী এখনও গাছতলায় ধূনি জ্বালাইয়া পড়িয়া থাকে ও ভজন গায়।

বেলা প্রায় ১০টার সময় স্নানাদি সমাপন করিয়া দেব-দর্শন করিতে মন্দির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম। ধূপ-দীপাদির পবিত্র পূতগন্ধে স্থানটা ভূর-ভূর করিতেছিল। "শিব! শিব! বম্! বম্! হর! হর!" রব মন্দির অভ্যন্তরে ধ্বনিত হইতেছিল। পূজারী মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বারবার মাথায় দুধ ঢালিতে ও বিল্বপত্র প্রদান করিতে বলিলেন; এই সকল ব্যাপার হইতে প্রাণের ভিতর বেশ একটা ভক্তির ভাব আকুলতার সহিত জাগিতেছিল; কিয়ৎক্ষণের জন্য বেশ একটু নির্ম্মল আনন্দ ও শান্তির আস্বাদ পাইলাম।

ঝাড়েশ্বরের পূজাদি সমাপন করিয়া বাসা অভিমুখে যাত্রা করিলাম। বহুদিন পরে দুইজন বাঙ্গালী ভক্তের অবির্ভাবে পুরোহিত যতটা প্রসন্ন হইয়াছিলেন, বিদায়কালে আশাতীত দক্ষিণা পাইয়া তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী সন্তুষ্ট হইলেন; এবং নানাবিধ অসম্ভব

আশীর্ব্বাদ-বাণ নিক্ষেপ করিয়া আমাদিগকে অতি সত্বর পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিতে বাধ্য করিলেন।

ঝাড়েশ্বরের মহাদেবের একটী বিশেষত্ব এই যে, তাঁহার মস্তকের উপর একটী ছিদ্র আছে, তাহাতে জল মিশ্রিত করিয়া দুগ্ধ অর্পণ করিলে তিনি হংসবৎ দুগ্ধের সারভাগ গ্রহণ করেন ও অসার জলভাগ বাহিরে ফেলিয়া দেন।

শিবরাত্রি উপলক্ষে এইখানে একটী মেলা বসে এবং নানাস্থান হইতে লোক-সমাগম হইয়া থাকে। এই মেলাটী দেবতার নামেই চলিয়া আসিতেছে।

বাসায় আসিয়া দেখি, আহারাদি সমস্তই প্রস্তুত—মধ্যাহ্ন-ভোজনটা বেশ সুচারুরূপেই নিষ্পন্ন হইল। বৈকালে বাজার দেখিতে বাহির হইলাম। এখানে সন্ধ্যার পর বাজার বসে, প্রচুর পরিমাণে মৎস্যাদি আমদানী হয়। এখানকার ধীবরেরা দিবাভাগে সমুদ্রে মাছ ধরে এবং সন্ধ্যার পর বাজারে, লইয়া আসে। এখান হইতে পমফ্রেট(Pumfret)নামক এক রকম সুস্বাদু সমুদ্রিক মৎস্য কলিকাতায় চালান দেওয়া হয়। ইহাদের সাহেব মহলে বড়ই আদর।

গোপীনাথ।

যাঁহারা পুরী তীর্থে গমন করেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই পথি-মধ্যে বালেশ্বরে অবতরণ করিয়া গোপীনাথ দর্শন করেন। গোপীনাথ একটী প্রধান তীর্থস্থান। গোপীনাথ সম্বন্ধে নানা প্রকার কিংবদন্তী শোনা যায়। ক্ষীরচোরা গোপীনাথ বলিয়া ভক্তদের মধ্যে ইহার বিশেষ খ্যাতি। বালেশ্বর হইতে আট মাইল উত্তরে গোপীনাথের মন্দির, পদব্রজে কিংবা গো-শকট সাহায্যে গমন করিতে হয়।

পরদিন রবিবার ভোর পাঁচটার সময় আমরা গোপীনাথ দর্শন করিতে রওনা হইলাম। পথটি বড়ই মনোরম। দুইদিকে বিস্তৃত শস্যপরিপূর্ণ ক্ষেত্র। সে দৃশ্যের তুলনা হয় না, যতদূর দৃষ্টি চলে ততদুর বোধ হয় যেন বঙ্গ-জননীর, শ্যামল স্নিগ্ধ বস্ত্রাঞ্চলখানি মৃদুল পবনহিল্লোলে দুলিতেছে। যেদিকে নয়ন ফিরাই, কেবল শ্যামল শস্যপরিপূর্ণ ক্ষেত্র। প্রভাত-সমীরণ মৃদুমৃদু বহিয়া আসিতেছিল। দুই একটি লোক মাঝে মাঝে রঙ্গমঞ্চে অভিনেতার ন্যায় দেখা দিতেছিল। দুই একটী পাখী গাছের ডালে বসিয়া ঊষার আগমনী গাহিতেছিল।

দূর হইতে এই পথটি দেখিতে বড়ই চিত্তাকর্ষক। ইহাকে যেন সুনিপুন চিত্রকরের তুলিকায় অঙ্কিত চিত্র বলিয়া ভ্রম হয়। উপরে মেঘহীন নির্ম্মল নীলাম্বর, অদূরে আকাশের কোলে দুইটী বড় বড় পাহাড়; উহাদিগকে নীলগিরি নামে অভিহিত করা হয়। দুই-দিকে প্রায় ছয় মাইল দীর্ঘ প্রান্তর, প্রান্তরের উপর শ্যামল শস্যক্ষেত্র। শস্যক্ষেত্রের শেষে ঘনশ্যামল তরুশ্রেণী, মধ্যে কেবল এই রক্তবর্ণ সরল রাজপথ চলিয়াছে। স্থানটি যেমন নির্জ্জন, তেমনি নয়নরঞ্জক।

প্রায় দুই মাইল পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি, এমন সময় আমাদের পশ্চাৎ হইতে কে যেন বলিয়া উঠিলেন "Good morning Baboos".

ফিরিয়া দেখি সেই নির্জ্জন পথে অশ্বপৃষ্ঠে একজন সাহেব!

অশ্বের হ্রেষাধ্বনি বা কোন প্রকার শব্দ আমরা কেহই শুনিতে পাই নাই। দুঃখের বিষয় সহসা তাঁহাকে অবলোকন করিয়া শিষ্টাচার-সম্মত অভিবাদন করিতে বিস্মৃত হইলাম। তিনি মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"I think, you are on your way to Gopinath.

"Yes sir."

"I suppose you are new-comers in the place."

"Yes, you are right.'

তিনি তখন বেশ পরিষ্কার বাঙ্গালায় জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনারা কি করেন ?" "কলিকাতায় ব্যবসা ও কাজকর্ম্ম করি।" "আপনি কি এখানে কর্ম্ম করেন ?" "হাঁ আমি এই জেলার Magistrate" তারপর তিনি নানাবিধ প্রশ্ন করিতে করিতে আমাদের সঙ্গী হইলেন। তাঁহার শিষ্টাচার দেখিয়া আমরা বিশেষ আপ্যায়িত ও সন্তুষ্ট হইলাম। প্রায় চারি মাইল আসিয়া পশ্চিমাভিমুখে যাইবার সময় তিনি বলিলেন— "আমি অন্য দিকে চলিলাম, good bye"

এবার আর ভুল হইল না, যথারীতি অভিবাদন করিলাম।

বেলা নয়টার সময় গোপীনাথের মন্দিরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। এই মন্দিরটি বহুদিনের পুরাতন। তখন মন্দিরের সংস্কারকার্য্য চলিতেছিল। হিন্দু কারিকরগণ কাজ করিতেছিল। আট মাইল হাঁটিয়া অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। নাটমন্দিরে পা ছড়াইয়া উপবেশন করিলাম। মন্দিরের সম্মুখে প্রকাণ্ড চত্বর—চত্বরের মধ্যে বৃহৎ নাটমন্দির। চারিদিকে চক্‌মিলান ঘর। এইখানে যাত্রীরা আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। মন্দিরের পশ্চাতেই রান্নাবাড়ী, ভাঁড়ার ঘর, ইত্যাদি অনেকগুলি ঘর আছে। একদিন ছিল যখন পায়ে হাঁটিয়া লোকে জগন্নাথ দর্শন করিতে গমন করিত, তখন গোপীনাথের বিশেষ জাঁকজমক হইত। দিনরাত যাত্রীর যাতায়াতে মন্দির ও চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থানসকল মুখরিত হইয়া উঠিত। মন্দিরের সম্মুখে একটী পুষ্করিণী— তাহার সোপানাবলী প্রস্তরনির্ম্মিত। পুষ্করিণীর জল এরূপ সবুজ বর্ণ হইয়া রহিয়াছে যে, তাহা মুখে দিতে স্বতঃই ভীতির সঞ্চার হইয়া

থাকে--মনে হয় সর্ব্ববিধ ব্যাধির বীজাণু যেন ইহার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। পাণ্ডা আসিয়া বলিলেন, "এইখানে চৈতন্যপ্রভু স্নান করিয়াছিলেন,—এইখানে উপবেশন করিয়াছিলেন, সুতরাং ইহার জল গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থল প্রয়াগতীর্থের জলের ন্যায় পবিত্র।" পাণ্ডা ঠাকুর পুনঃ পুনঃ আমাদের স্নান করিতে অনুরোধ করিলেন। আমরা তাহাকে জানাইলাম এই পুষ্করিণীর প্রতি আমাদের প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা আছে ও ভবিষ্যতে থাকিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, তবে এখন আমরা তীর্থ করিতে আসি নাই, বেড়াইতে আসিয়াছি, স্নানার্থ বস্ত্রাদি সঙ্গে করিয়া আনি নাই। তারপর সেই জল স্পর্শ করিয়া আমরা পবিত্র হইলাম। তাড়াতাড়ি দেবতা দর্শন করিয়া গত রজনীর একটুখানি প্রসাদ পাইয়া সেস্থান হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম। বেলা প্রায় বারটার সময় ঘর্ম্মাক্তকলেবরে বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

দুই দিন পরে রাত্রি থাকিতে থাকিতে, আমরা সমুদ্র দেখিতে বহির্গত হইলাম। পূর্ব্ব হইতে একখানি গো-যান ঠিক করিয়া রাখা হইয়াছিল। রাত্রি থাকিতে গাড়োয়ান আসিয়া আমাদের উঠাইল। সমুদ্র দেখিয়া ফিরিতে সন্ধ্যা হইবে বলিয়া সঙ্গে খানকয়েক পাঁউরুটী, খানিকটা মাখন, ও কিছু মিষ্টান্ন লইয়াছিলাম। সমুদ্রে সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত দেখিতে না কি অপূর্ব্ব; সেই জন্য পথে আমরা গাড়োয়ানকে খুব তাড়া দিতে আরম্ভ করিলাম, সূর্য্যোদয় দেখিবার জন্য মন উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছিল। বালেশ্বর হইতে সমুদ্র যাইবার পথটি বড়ই মনোরম, খুবু উঁচু—দুই দিকে জলাভূমি। এই রাস্তার মাঝে মাঝে গ্রাম দৃষ্ট হয়; সমুদ্রতীরে পৌছিবার অনেক পূর্ব্বেই পূর্ব্বদিক রক্তিম ছটায় অনুরঞ্জিত হইয়া উঠিল, আমরা গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া দ্রুত চলিতে লাগিলাম। তখন পথে

দুই একজন লোক শাকসব্‌জির বোঝা লইয়া সহরের অভিমুখে চলিয়াছে, দুই একটী বালক কুটীরের দ্বারে বসিয়া মুড়ি খাইতেছে, কোথায় বা শ্রমশীলা বধূগণ গৃহপ্রাঙ্গণে গোময় লেপন করিতেছে, কেহ বা রোরুদ্যমান শিশুটিকে ভুলাইবার জন্য গৃহদ্বার অল্প মুক্ত করিয়া চলিষ্ণু গরুর গলদেশের ঘণ্টার ধ্বনি বালককে শুনাইতেছে। এই সব দৃশ্য বড়ই মধুর লাগিল। গাড়োয়ান পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল, "আপনারা গাড়ীতে উঠুন, সমুদ্র এখান হইতে এক ক্রোশ পথ।"

আর গরুর গাড়ী চড়িতে ভাল লাগিল না। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে চলিলাম।

অর্দ্ধক্রোশ থাকিতেই পথে পায়ে পায়ে নীত বালুকারাজি দৃষ্ট হইল। দূরে চাহিয়া দেখি যেন একটী অভ্রের প্রাচীর সূর্য্যালোকে ঝক্‌ ঝক্‌ করিতেছে, তাহা হইতে যেন শত সহস্র আলোকবিন্দু বিচ্ছুরিত হইতেছিল। গাড়ী আমাদের অনুসরণ করিতে সক্ষম হইল না। তখন বেলা প্রায় সাতটা বাজিয়াছে। অরুণের মধুর রশ্মি মুখের উপর পড়িতে লাগিল। সেদিকে কিন্তু আমাদের লক্ষ্য নাই—গন্তব্য পথাভিমুখে ছুটিতেছিলাম। ক্রমে ক্রমে পথটা বালুকাময় হইয়া আসিল, আর জুতা চলে না, সুতরাং গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। গাড়োয়ান তখন খোলা মাঠের পথে—প্রভাত সমীরে তাহার অভ্যস্ত সঙ্গীতের সুধা-ভাণ্ড ঢালিয়া দিতেছিল, তাহার কণ্ঠনিঃসৃত উড়িয়া গান 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিতেছিল।' গাড়ীতে জুতা জামা রাখিয়া সেই পূর্ব্ব-বর্ণিত অভ্রের প্রাচীরের ন্যায় বালিয়াড়ীর উপর উঠিলাম। সেখান হইতে দৃষ্টি যতদূর নিক্ষেপ করা যায়, তাহাতে যাহা দেখিলাম তাহা

ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। বিস্তীর্ণ জলধি, অনন্ত-জলোচ্ছ্বাস—সংখ্যাতীত তরঙ্গের জন্মমৃত্যু—অসীমের মধ্যে সসীমের কল্পনা যেন হেথায় লয় পাইতে লাগিল, আকাশের সহিত বারিধি যেখানে সন্ধি করিয়া কাল কসি টানিয়া দিয়াছে, সেখানে ব্যবধানের পরিবর্ত্তে মিলনের বিরাটত্ব বিকসিত হইয়া উঠিয়াছে।

পর্ব্বতের মত উচ্চ বালিয়াড়ীর চূড়ায় দণ্ডায়মান হইয়া মনে পড়িয়া গেল সেই ভীমকায় কাপালিকের কথা, সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িয়া গেল সেই করুণাকাতরকণ্ঠনিঃসৃত প্রশ্ন "পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ?" আমাদের মনে হইল, আমরাও বুঝি আজ পথ হারাইয়াছি—মনে হইল, যদি পথ চিনিয়া আমরা গাড়ীর কাছে পৌঁছাইতে না পারি তবে হয়'ত অবশেষে এই সমুদ্রের সৈকতে ছুটিয়া বেড়াইতে হইবে। কতবার মনে হইল, যদি সমুদ্র একবার তাহার অসংখ্য বীচিমালা সংহরণ করে, তবে তাহার অনন্ত অসীম বারিরাশির বিশাল বিস্তৃতি উপলব্ধি করি।

এই সময় সহসা তরঙ্গগুলি ক্রমশঃ পশ্চাদ্‌গামী হইতে সুরু করিল। আমরা যেখানে দণ্ডায়মান ছিলাম, সেখান হইতে জল সরিয়া যাইতে লাগিল; সে এক অপূর্ব্ব ব্যাপার! ঊর্ম্মিগুলি ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিতেছে, যেন এক মুহূর্ত্তেই তটভূমি প্লাবিত করিয়া ফেলাই তাহার লক্ষ্য, তাহার কাজ, তাহার সাধনা; কিন্তু পরক্ষণেই পরস্পরের ঘাত প্রতিঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া তাহারা অসংখ্য ফেনপুঞ্জের সৃষ্টি করিতেছে। দেখিতে দেখিতে জলধি প্রায় এক মাইল সরিয়া গেল, আমরা উল্লাসে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলাম। তাহার মধ্যে যে কি আনন্দ! কি তৃপ্তি! কি সুখ! তাহা বলিতে পারি না। যখন সমুদ্র সরিয়া যাইতেছিল তখন সেই

জলমগ্ন ভূমির জলহীন অবস্থা প্রকাশ পাইল, তাহা যেন সুচিক্কণ সিমেণ্ট করা গৃহতল বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

আমরা যখন সমুদ্রের অভিমুখে ছুটিতেছি তখন দেখি, হাজার হাজার সজীব কড়ি, ঝিনুক, শঙ্খ, ও নানাবিধ বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত জলজন্তুও ছুটিয়াছে—এই দৃশ্য আমাদের নিকট যেন কবির কল্পনা বা স্বপ্ন বলিয়া মনে হইল। এখানে একটী Light house ও দুর্গ আছে; অনেকগুলি ইংরাজ ঐ দুর্গে অবস্থান করে। এখানকার সমুদ্র তত গভীর নয়। একটী জেলের মেয়ে আসিয়া যদি না বলিত,—"এইরূপ জল সরিয়া যাওয়া সমুদ্রে "ভাটা পড়া" এবং ইহা বড় বেশীক্ষণ থাকে না, এখনি জোয়ার আসিবে, তখন আমরা দ্রুত ছুটিয়াও কিনারায় উঠিতে পারিব না, তাহা হইলে জানি না কি ভয়ানক বিপদে পড়িতাম। সমুদ্রে স্নান করিয়া কড়ি, ঝিনুক, শঙ্খ কুড়াইয়া বেলা আন্দাজ একটার সময় সেখান হইতে বাসায় যাত্রা করিলাম। বাসায় পৌছিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গেল। পরদিন সেবারকার মত অভিযান শেষ করিয়া, বন্ধুর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, কলিকাতা যাত্রা করিলাম। সেই কড়ি ঝিনুক শঙ্খগুলি প্রতিবার লক্ষ্মীপূজার সময় গৃহিণী যখন সাজান, তখন আমার সেই জেলের মেয়ের সাবধানতার কথা মনে পড়িয়া যায় এবং তাহাকে ধন্যবাদ না করিয়া থাকিতে পারি না।

খুরদা।

খুরদারোড কলিকাতা হইতে ২০৩ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা একটী বড় জংসন্। এখান হইতে দুইদিকে দুইটি শাখা লাইন চলিয়া গিয়াছে; একটী ভগবান জগন্নাথদেবের পুরীর দিকে, অপরটি মাদ্রাসপ্রদেশের অভিমুখে। "খুরদারোড" পুরীর পথে পড়ে বলিয়া ইহার নামের সহিত অনেকেই পরিচিত। সময় সময় অনেককে এখানে মেল হইতে অবতরণ করিয়া পুরীর জন্য নির্দ্দিষ্ট গাড়ীতে আরোহণ করিতে হয়। হাওড়া হইতে যাত্রা করিয়া পুরীর পথে এই খানে প্রভাত হয়। সুতরাং এখানকার ভোরবেলাটি বড়ই মনোরম ও চিত্তাকর্ষক! স্নিগ্ধ সমীরণ সমুদ্র হইতে মৃদুমন্দ প্রবাহিত হইয়া পথিকের অঙ্গস্পর্শে বিনিদ্র রজনীর সমস্ত অবসাদ ক্লান্তি, মুহূর্ত্তে অপসারিত করিয়া দেয়। রাত্রের অন্ধকারের মধ্যে যাত্রা করিয়া পথে দিবার প্রথম আলোকের সহিত যেখানে পরিচয় হয়, সেটি নিজ খুরদারোড। খুরদা সেখান হইতে তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী হইলেও তাহার দিগন্তপ্রসারিত শস্য-শ্যামল প্রান্তর, নীহার-সমাচ্ছন্ন গিরিশ্রেণী, নীল নির্মেঘ নভোমণ্ডল নয়নসম্মুখে স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। এখানে যখন গাড়ী আসিয়া পৌঁছায়—তখন যাত্রীদিগের প্রাণে জগন্নাথদর্শনের আকুলতা জাগিয়া উঠে—আর ত অধিক দূর নাই; নিশীথিনীর অবসানে প্রভাতের সুশীতল সমীরণ কমনীয় করস্পর্শে তাহাদের আহ্বান করে। অদূরে সুবর্ণকিরণে ঝলসিয়া তরুণ অরুণউদয় কি মধুর দেখায়! এমন সময় সাধারণতঃ মানুষের মন বেশ সুস্থ, নিশ্চিন্ত, জড়তা মলিনতাবিহীন থাকে। তাহার উপর এই নিষ্কলঙ্ক স্নিগ্ধ মনোরম দৃশ্য তীর্থযাত্রীদিগের হৃদয়ে যে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবরাজ্যের পবিত্রতা জাগাইয়া তোলে, তাহার তুলনা করা অসম্ভব।

আমরা যখন খুরদায় আসি, তখন কার্ত্তিক মাস। পুরীর গাড়ীতে অসম্ভব ভিড়। অনেকেই ৺পূজার ছুটিতে স্বাস্থ্যপরিবর্ত্তনের জন্য আসিয়া দেবতাদর্শন করিয়া যাইতেছেন। 'খুরদারোড'—পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি,—একটী রেলওয়ে জংসন মাত্র। এখানে চাকুরী উপলক্ষে অনেকগুলি ইংরাজ, তৈলিঙ্গী, মাদ্রাজী, উড়িয়া, খুব অল্প-সংখ্যক বাঙ্গালীও অবস্থান করেন। এখান হইতে নিজ খুরদা সাত মাইল দূরে—গো-যান সাহায্যে গমনাগমন করিতে হয়। খুরদা রোডের জলবায়ু ভাল, তবে নিজ খুরদার মত নয়। খুরদার মত স্বাস্থ্যকর স্থান এ অঞ্চলে বড় পরিলক্ষিত হয় না।

ভুবনেশ্বর হইতে জনকয়েক বাঙ্গালীবাবু আমাদের গাড়ীতে উঠেন। তাঁহারা খণ্ডগিরি দেখিয়া পুরীদর্শনে চলিয়াছেন। এই অল্প সময় টুকু গাড়ীতে বড় আনন্দে কাটিয়াছিল। কান্তকবি রজনীকান্তের ছবি 'মানসী'তে দেখিয়া তাঁহারই প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইল। তাঁহাদের মধ্যে একজন রজনীবাবুর বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তিনি কবির সম্বন্ধেদুঃখ প্রকাশ করিয়া নানাকথা বলিতে লাগিলেন। কবি শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কিরূপ নিদারুণ যন্ত্রণার ভিতর হাস্যমুখে বীণাপাণির সেবায় অনুরাগ ও আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা মুগ্ধ হৃদয়ে সেই সকল কথা শুনিতে লাগিলাম। ভক্তি ও শ্রদ্ধায় নয়ন অশ্রু-পরিপূর্ণ হইয়া আসিল। ভুবনেশ্বর হইতে খুরদারোড বড় বেশী দূর নয়; শীঘ্র গাড়ী আসিয়া পৌঁছিল। আমি তখন তাঁহাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম।

মনে করিয়াছিলাম, হয়ত কেহ না কেহ আমাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছে। কিন্তু অত ভোরে শয্যাত্যাগ করিয়া আসা একপ্রকার তীব্র সাজা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং সহজে কে

আর ঘাড় পাতিয়া সেটা বহিতে চায় বলুন। শীতবস্ত্র মুড়ি দিয়া অনেকগুলি মুখের নিকট মুখ লইয়া গেলাম, পাছে শেষে বাসায় গিয়া আপ্‌শোষ করিতে হয় 'আহা লোকটা গিয়াছিল, দেখা হয় নাই'।

ষ্টেসনের নিকটেই আমার আত্মীয়ের বাসা। জিনিসপত্রগুলি, কেল্‌নার কোম্পানীর - অতিথিশালায় 'জিম্মা' দিয়া বাসায় চলিলাম।

বাসার নিকট গিয়া ডাকাডাকি আরম্ভ করিতেই গৌরী চক্ষু মুছিতে মুছিতে আসিয়া দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিল।

তারপর সে একটু দাঁড়াইয়া আমার মুখের দিকে তাকাইল, চিনিতে পারিয়া আগ্রহভরে ছুটিয়া আসিয়া গলা জড়াইয়া ধরিল - সেই সপ্তম-বর্ষীয়া বালিকার আহ্বানে যথেষ্ট আনন্দ ও সুখ পাইয়াছিলাম, তাহার হর্ষোৎফুল্ল চঞ্চল নয়নে যে পুলকআলোক দেখিয়াছিলাম, এই কয়দিনের না দেখার মধ্যে গৌরী তাহা কোথায় পাইল বুঝিলাম না।

"গৌরি, তুই কেমন আছিস্" বলিতে সে ঘাড় নাড়িল, বলিল "বেশ আছি"। তারপর বলা নেই, কওয়া নেই, হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল।

আমি যে বাসায় গিয়া উঠিলাম সেটী রেলওয়ের সীমানার ভিতর। বাসার চতুর্দ্দিকেই রেল-বেষ্টিত সাহেবদিগের বাংলা। দুই একঘর মহারাষ্ট্রীয় ও তেলুগু ব্যতীত সব গুলিই সাহেবদিগের বাড়ী।

এখান হইতে পুরী সাতাশ মাইল দূরে। চিলকা-হ্রদ খুব নিকটেই।

'খুরদারোড' স্থানটী একটী পাহাড়ের উপর স্থাপিত বলিয়া মনে হয়। প্লাটফরমের উপর হইতে বেশ স্পষ্ট দেখা যায় যে, দুইদিককার লাইন চালু হইয়া গিয়াছে। গাড়ী খুরদায় আসিবার সময় ধীরে ধীরে

উঠিতে থাকে এবং পুরী ও মান্দ্রাজের অভিমুখে যাইবার সময় অল্পে অল্পে নামিয়া যায়। এই স্থানটি উচ্চ হওয়াতেই অনেকদূর পর্য্যন্ত নয়নগোচর হয়।

যতদূর দৃষ্টি চলে ততদূর পর্য্যন্ত মুক্ত শ্যামল ক্ষেত্র, মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র বৃহৎ গিরিশ্রেণী—আর কোথাও বা দুই চারিটি তরুশ্রেণী সৌন্দর্য্য-মুগ্ধ স্তব্ধ পথিকের মত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। খুরদারোড জায়গাটি আমার বড় পছন্দ হইয়াছিল। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের এত শোভা-সম্পদ একাধারে খুব কম অবলোকন করিয়াছি। উৎসব-দিনের মত মাঝে মাঝে যাত্রীগাড়ী আসিলেই স্থানটি মুখর ও চঞ্চল হইয়া উঠে। তার পরেই নীরব নিস্তব্ধ। কর্ম্ম-কোলাহলের শব্দরোল ছুটিয়া আসিয়া শান্তি-অন্বেষী প্রবাসী হৃদয়ে অভাব-অভিযোগ বা বিরক্তি-বেদনা আনিয়া দেয় না।

ষ্টেশনটির নাম খুরদারোড হইলেও এই স্থানটির প্রকৃত নাম ‘জাট্‌নি’। ঐ নামেই পোষ্টাপিসের নামকরণ হইয়াছে। এখানে চারপাঁচজন মাত্র বাঙ্গালী আছেন। তাঁহারা রেলওয়ে, মেল সারভিস, হাঁস্‌পাতালে ও কেলনার আপিসে কর্ম্ম করেন। পশ্চিমে বাঙ্গালীদিগের ভিতর বেশ একটা আন্তরিক সহানুভূতি পরিদৃষ্ট হয়; কিন্তু দক্ষিণে তেমন দেখিলাম না। ডাক্তারবাবু অতীব অমায়িক লোক। সকলকেই নিজের আত্মীয়ের মত দেখেন। প্রতিদিন বেড়াইতে বাহির হইয়া সকল বাড়ীর খোঁজ-খবর লইয়া যান। ভদ্রলোক বড় মিষ্টভাষী ও সদালাপী। তিনি সপরিবারে এখানে থাকেন। খুরদারোড হাঁসপাতালের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ভার তাঁহার স্কন্ধে। আমাদের বাসার কিছুদূরে মাঠের সম্মুখেই হাঁসপাতাল, তাহারই সন্নিকটেই ডাক্তারবাবুর বাসা। হাঁসপাতালটির চারিদিকে ঘন তরুশ্রেণীর স্নিগ্ধ

ছায়া ও নির্ম্মল বাতাস যাতনাক্লিষ্ট রোগীর অন্তরে তপোবনের শান্তি ও সুধা একসঙ্গে ঢালিয়া দেয়। এই হাঁসপাতালটি দেখিলে আতঙ্ক না হইয়া বরং আশার সঞ্চার হয়। ডাক্তারবাবুর সহিত আলাপ করিয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম। এখানকার রেলের পথগুলি পরম সুন্দর। দুই দিকে সম-উচ্চ শ্রেণীবদ্ধ-তরুশ্রেণী। লাল-কঙ্কর-সমাচ্ছন্ন রাস্তাগুলি পরিষ্কার। জঙ্গল কাটিয়া ষ্টেশন স্থাপিত হইয়াছে, সেই উপলক্ষে একটী সামান্য বাজারও বসান হইয়াছে। এই বাজারে তরিতরকারি বড় পাওয়া যায় না। তবে আশপাশের গ্রাম হইতে চা'ল আমদানী হইয়া নানা স্থানে রপ্তানী হইয়া থাকে। পাটের ব্যবসা উপলক্ষে অনেক লোক বাজারে দুই চারখানি আড়ত করিয়াছে। কমলানেবু, আতা, রম্ভা প্রভৃতি ফল প্রচুর পরিমাণে সুলভমূল্যে পাওয়া যায়। মৎস্য বড় পাওয়া যায় না। এখান হইতে খুরদার গরুর গাড়ীর যাতায়াত ভাড়া বার আনা।

উড়িষ্যাপ্রদেশে সুলভের মধ্যে গো-যান ভাড়া! তবে আরোহণের সুখটী ভুক্তভোগী ভিন্ন অপরের পক্ষে অভিনব হইতে পারে। এইখান হইতে সরল লাল পথ খুরদার মধ্যে গিয়াছে। এই পথের দুইধারে কেবল বিশাল মুক্ত ক্ষেত্র ও গিরিশ্রেণী।

একদিন মাত্র বিশ্রাম করিবার পরদিন বন্ধু জ্ঞান বাবু আসিয়া জুটিলেন, তাঁহার সমভিব্যাহারে নিজ খুরদা দেখিতে বেলা দুইটার সময় রওনা হইলাম।

একখানি সতরঞ্চ ও একটী উপাধান গাড়ীর শয্যা হইল। শয়ন করিয়া যাইব এইরূপ সঙ্কল্প। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা ঘটে নাই। সারা পথটি দেখিতে দেখিতে চলিলাম। অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই আমাদের গাড়ী নবনির্ম্মিত রাস্তা হইতে পুরাতন পথে গিয়া পড়িল। পুরাতন

পথ শুনিয়া নাসিকা সঙ্কুচিত করিবার কিছুই নাই। নূতন অপেক্ষা এই পুরাতন পথটি বড়ই মনোরম। কোথাও একটুমাত্র উঁচুনীচু নাই, সমস্ত পথটি সরল, সমতল, পরিষ্কার। উভয় পার্শ্বে সম-উচ্চ তরুশ্রেণী। তাহাদের মধ্যে নানাজাতীয় বৃক্ষ নয়নগোচর হয়। অধিকাংশই আম, জাম, বট, দেবদারু, শিরিষ, শাল, শিমু প্রভৃতি। রাস্তার উভয় পার্শ্বের নিম্নেই শস্যশ্যামল ক্ষেত্র। প্রায় পরিপক্ক শস্যে পরিপূর্ণ ও সমুজ্জ্বল, ক্ষেত্রগুলি তখন কনকাভ ওড়ণার মত মৃদু সমীরণ সংস্পর্শে তরঙ্গায়িত হইতেছিল। কোথাও বা ক্ষুদ্র তটিনীর স্বল্প বারিরাশি রৌদ্রকিরণে জরির পাড়ের মত ঝিকিমিকি করিতেছিল। দূরে, কঠিনহৃদয় পাহাড়গুলি যেন স্তব্ধ ও নির্ব্বাক্ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে দৃশ্য কি চিত্তাকর্ষক! কি প্রাণস্পর্শী!

এ প্রকার সুন্দর রাস্তা ইহার পূর্ব্বে আর কখনও দেখি নাই। টুণ্ডুলার ক্ষেত্রসমূহের মধ্যে দিয়া 'গ্রাণ্ড-ট্রঙ্ক রোড দিল্লী অভিমুখে গিয়াছে দেখিয়াছি; তাহার সৌন্দর্য্য মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব কিন্তু এমনটি নয়। ইহা অপেক্ষা সে পথ প্রস্থে ও দীর্ঘে অনেক বড়, অনেক প্রাচীন বৃক্ষাদিসুশোভিত, তথাপি বলিব এমনটি নয়! সে পথের উপর কেমন যেন একটা অতীতের মলিন রেখা পড়িয়াছে, বৃক্ষগুলি যেন শীর্ণ, দুর্ব্বল, জীবন্মৃতাবস্থায় পড়িয়া আছে। পথের বক্ষের দীর্ঘশ্বাস, যেন মনে হয় ঘূর্ণী বাতাসের মত ব্যাকুল অন্তরে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। তাই বলিতেছি সে পথ এমনটি নয়!

গো যান আরোহণে বন্ধু জ্ঞান সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত ও অনভিজ্ঞ। সুতরাং বেচারীর অত্যন্ত কষ্ট হইতেছিল। মাঝে মাঝে বাঁশের ছইয়ের সহিত মাথার বেশ একটু ঠোকাঠুকি চলিতেছিল। আর সে 'উহু উহু' করিয়া পদব্রজে গমনের জন্য অসংখ্য যুক্তির অবতারণা করিতে লাগিল।

আমাদের সারথি ছিল একজন উৎকলবাসী। হাস্যের সহিত তাহার তাড়াতাড়ি কথা বলা আমাদের মোটেই বোধগম্য হইত না। তাহার সুমিষ্ট বাণীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিলেই সে ভারি রাগিয়া উঠিতেছিল। তাহার বিশ্বাস, যে তাহার কথা প্রায় বাঙ্গালা কথার মত সরল ও বাঙ্গালীর অনায়াস বোধগম্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। খুরদার অনেকগুলি বাঙ্গালী বাবুও নাকি তাঁহার এই মত সমর্থন করিয়াছেন।

রাস্তার বক্ষ হইতে মাঝেমাঝে এক একটী সরু পথ মাঠের উপর নামিয়া গিয়াছে। সেগুলি কোনো একটী পাহাড়ের কোলে গিয়া মিশিয়াছে। দুই চার ঘর কৃষকের কুটীরকে অবলম্বন করিয়া এই স্থান-গুলি এক একটী গ্রামের তালিকাভুক্ত হইয়াছে। এ তল্লাটে লোকের বাস অত্যন্ত কম। পথেও লোকজন খুব কম দৃষ্ট হয়। মাঝে মাঝে দুই একখানি গরুর গাড়ী যাত্রী লইয়া ষ্টেশন অভিমুখে চলিয়াছে। দূরাগত গরুর কণ্ঠলগ্ন ঘণ্টার শব্দ নির্জ্জন পথের উপর বেশ মধুর শুনায়। জ্ঞানবাবু গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বাড়ী এখান হ'তে কত দূর ?"

সে তখন অস্তমিত সূর্য্য কিরণোদ্ভাসিত অদূরবর্ত্তী একটী পাহাড়ের উদ্দেশে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল "ওই বরুণা পাহাড়ের কোলে।"

সারি সারি পাহাড় সুতরাং জ্ঞানবাবু বলিলেন "কোনটি ?"

সে অল্প উচ্চস্বরে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল "বরুণী দেবীর পাহাড় কোনটি তা জানেন না, কি আশ্চর্য্য !"

আমি বলিলাম "উনি নূতন এদেশে এসেছেন। আমি ও সব জানি। তুমি শিগ্‌গির গাড়ী চালাও, নতুবা ফিরিতে অনেক রাত্রি হয়ে যাবে।"

"আর বেশী দূর নাই, আধ ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছাইব।" বলিয়া বলিল "বাবু মহাশয়, একবার দেশলাইটা দিন ত। তারপর শালপাতা জড়ান খানিকটা দোক্তার মুখে সাদরে অগ্নি সংযোগ করিল। এইবার সে তাহার সারথ্যকার্য্যে সাধ্যমত কৌশল প্রদর্শন করিতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করিল না।

আমি জ্ঞানবাবুর অঙ্গ ঠেলিয়া বলিলাম "আমাদের সারথির পায়াভারি দেখ্‌চি।"

জ্ঞানবাবু হাসিয়া উত্তর করিলেন "এ দেশের অনেকেরই পদগৌরব আছে দেখিতেছি।" ধূমপানে গাড়োয়ানের বোধ হয় বিশেষ স্ফূর্ত্তি হইল। সে প্রথমে মিহিস্বরে সংগীতবিদ্যার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইল। সে মধুর, কি কর্কশ, শ্রুতিযোগ্য কি অযোগ্য, বোধগম্য কি অগম্য, তাহা যাঁহারা উৎকলদেশীয় সঙ্গীত শ্রবণের সৌভাগ্যলাভ করিয়াছেন তাঁহারা বিশেষ অবগত আছেন। তবে আমার মনে হইতেছিল থামিলেই বাঁচি।" আমি বলিলাম "তুমি ত বেশ গাহিতে পার?" সে তখন অত্যন্ত খুসী হইল। মুখখানির উপর বিনয়ের ভাব আনিয়া, কতই সৌজন্য দেখাইয়া মৃদুমধুর হাসিয়া বলিল "আজ্ঞে পারি, তেমন ভাল পারি কি? কিন্তু বাঙ্গালীবাবুরা রাত্রিবেলা আমার গাড়ীতে এলেই বলেন 'তুমি গীত গাও আর গাড়ী চালাও।' আমার গান শুনতে শুনতে তাঁরা খুব হাসেন।"

সে পুনরায় গান ধরিবার জন্য সুর ভাঁজিতেছে শুনিয়া জ্ঞানবাবু বলিলেন, "হাঁ হে, এদেশে তোমরা কত দিন আছ?"

একগাল হাসিয়া সে কহিল "তখন ইংরাজ বাহাদুর এ দেশে আসে নাই। মোর বাপ্‌মার বাপ্‌মা, তার বাপ্‌মা, জগন্নাথপ্রভুর কৃপায়

এখানে বাস কর্‌ছে। সে কত যুগ হয়ে গেল। এদেশে কি এমন জঙ্গল ছিল বাবু! তারপর একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল 'খুব বড় সহর ছিল। ইংরাজ বাহাদুরের সঙ্গে একদিন রাজার বড় যুদ্ধ হয়েছিল।* বরুণা ও করুণা দুই বোন রাজার সেনাপতি হ'য়ে যুদ্ধ করেছিলেন। সরকার বাহাদুরের ফৌজ কি সে লড়াইয়ে টে'কতে পার্‌ত? তাহারা যতই কামান ছাড়তে লাগল, আর বরুণা ও করুণাদেবী রাজার আগে গিয়ে সে সব গোলা লুফে লুফে ছুড়ে ফেলে দিতে লাগলেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "যে রাজা যুদ্ধ করেছিল তার নাম কি?" সে তখন বেশ একটু উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল সুতরাং তীব্রস্বরে উত্তর করিল "নারায়ণ ভঞ্জের নাম শুনেন নাই।" এইবার আমাদের সারথি ঐতিহাসিক হইয়া দাঁড়াইবার উপক্রম করিল। সে বলিতে লাগিল "নারায়ণভঞ্জের সঙ্গে তিন দিন তিন রাত্রি অনবরত লড়াই চল্‌তে লাগ্‌ল। সরকার বাহাদুরের জিত হবার কোনও আশা নাই দেখে তাহারা একটা অন্যায় মতলব ঠিক করলে। একটী গরু কেটে সেই রক্তে গোলা ভিজিয়ে যেমন ছুড়লে, আর অমনি অপবিত্র গোরক্তের ভয়ে বরুণা ও করুণা দেবী রাজাকে ডেকে বল্লেন, এবার আর আমরা থাকতে পারব না; ঐ গোলা আমাদের অঙ্গ স্পর্শ করলে আমরা ম্লেচ্ছ হয়ে যাব। তারপর তাঁরা আকাশে মিলিয়ে গেলেন। তখন সেই গোলা এসে রাজার সৈন্যের উপর পড়ল, আর হাজার হাজার লোক মরতে লাগল। কামানের সঙ্গে তীর ধনুক তলোয়ার কতক্ষণ পারে বলুন?

* পুরুলার একটী বড় পাহাড় আছে, উহার নাম 'বরুণা' পাহাড়। অনেকে বলেন ইহা পরেশনাথ পাহাড়ের অপেক্ষা উচ্চ।

আমি বলিলাম "তা'ত বটেই! কামান আর তলোয়ার! আকাশ আর পাতাল!"

জ্ঞানবাবু মুখে রুমাল দিয়া হাসিতেছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "যে লোকগুলি সেই গোলার আঘাতে মরে ছিল, তাহাদের বোধ হয় আর সৎকার হয় নাই। তাহারা তখন ম্লেচ্ছ হয়ে গিয়েছিল কি বল?"

"আজ্ঞে হাঁ"

এবার আমরা উভয়ে হাস্য সংবরণ করিতে পারিলাম না। সে তখন নানা অলৌকিক গল্প সুরু করিয়াছিল। আমাদের মত নির্ব্বিরোধ শ্রোতাও বোধ হয় তাহার অদৃষ্টে ইতিপূর্ব্বে আর লাভ হয় নাই। জ্ঞানবাবু বলিলেন "এদের কি অন্ধ বিশ্বাস! এরা এসব কথা ত অম্লান বদনে বলিয়া যায়।"

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বেই আমাদের রথ বরুণা-দেবীর পাহাড়ের পাদমূলে গিয়া উপস্থিত হইল। এই পর্ব্বত হইতে একটী ক্ষুদ্র তটিনী নির্গত হইয়াছে। সারথি এই নির্ঝরিণীর কতই কীর্ত্তিকথা বলিতে লাগিল। ইহার মত জল নাই। এই জল বরুণাদেবীর পাদপদ্ম হইতে বাহির হইয়াছে। দেবীর চরণামৃত পান করিলে কোনো রোগ থাকে না। সেইজন্য তাহাদের অসুখ খুব কম। সে আমাদের পুনঃ পুনঃ সেই জল পান করিতে অনুরোধ করিল। এই নিরক্ষর নগণ্য উৎকল-বাসীর নির্ম্মল বিশ্বাস অবলোকন করিয়া আমরা মুগ্ধ হইলাম। তাহার সরল বিশ্বাসে পাছে আমাদের অধুনিক সভ্যতার সন্দেহ ছাপ পড়ে, মনে করিয়া দুই গণ্ডুষ জল আগ্রহভরে পান করিলাম।

গাড়ীতে জুতা চাদর ছাড়িয়া পাহাড়ে আরোহণ করিলাম। গাড়োয়ান আমাদের পথ-প্রদর্শক হইল। তখন পশ্চিম গগনে

সূর্য্যদেব ঢলিয়া পড়িয়াছেন। পাহাড়স্থিত বৃক্ষরাজির উপর ছায়াবাজির মত টুকরা টুকরা রৌদ্র মিলাইয়া আসিতেছে।

পাহাড়টি খুব উঁচু। বাঙ্গালার মধ্যে পরেশনাথ পাহাড় সকল অপেক্ষা উচ্চ বলিয়া আমার ধারণা ছিল। কিন্তু বোধ হইল এ পাহাড়টি তাহা অপেক্ষাও উচ্চ। পাহাড়ের উপর হইতে নিম্নে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেই দেখিলাম, চতুর্দ্দিকে কাল পাহাড়। কাল পাহাড়ের ফ্রেমে একখানি স্বভাবচিত্র কে যেন বাঁধাইয়া রাখিয়াছে। দূরে অনেকগুলি পুরাতন প্রাচীর ও অট্টালিকার ভগ্নস্তূপ দৃষ্টিগোচর হইল। অনুসন্ধানে জানিলাম সে গুলি প্রাচীন নগরের ভগ্নাবশেষ। একটী বৃহৎ মৃত্তিকার স্তূপের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক গাড়োয়ান বলিল "ঐখানে রাজার বাড়ী ছিল। সেই ভগ্নস্তূপের প্রতি তাকাইয়া অনেক কথা স্বপ্নের মত স্মৃতিপথে জাগিয়া উঠিল। একদিন যে সৌধচূড়ার উপর উড়িষ্যাধিপতির গৌরব পতাকা উড্ডীন হইত—সেইখানে কতকগুলি পুরাতন ইষ্টক স্তূপীভূত হইয়া বর্ত্তমানকে ধ্বংসের আশঙ্কায় শঙ্কিত করিতেছে।"

উড়িষ্যাপ্রদেশে খুরদা—হিন্দুরাজার স্বাধীন রাজধানী ছিল। একদিন ছিল যখন মহারাষ্ট্রীয়দিগের বিপুল অশ্বারোহী সৈন্যদল খুরদার ঘন নিবিড় জঙ্গল ভেদ করিতে পারে নাই এবং তাহার চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত শৈলশ্রেণীও লঙ্ঘন করিতে বৃথা প্রয়াস পাইয়াছিল। ১৮০৪ সালে খুরদার রাজা, নারায়ণভঞ্জ ইংরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠেন এবং তাহার পরিণামে তাহার রাজ্য ইংরাজাধিকারে বাজেয়াপ্ত হইয়া যায়।

১৮১৭ ও ১৮১৮ সালে এখানকার কৃষকগণ একবার বিদ্রোহাচরণ

করিয়াছিল। কিন্তু খুব শীঘ্র তাহাদিগকে শান্ত করিয়া ফেলা হয়। ইহার পর হইতে যদিও খুরদার রাজা কোনও প্রকার স্বাধীন ক্ষমতা লাভ করে নাই, তথাপি এ অঞ্চলের লোকে তাঁহাকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিত। কারণ এই রাজবংশ উত্তরাধিকারসূত্রে মহাপ্রভু জগন্নাথের শ্রীমন্দিরের রক্ষক বলিয়া সম্মানিত হইয়া আসিতেছে। ১৮৭৮ সালে খুরদার রাজা হত্যা অপরাধে দ্বীপান্তর গমন করেন। পুরীর পথে পড়ে বলিয়া খুরদারোডের সহিত আমরা যতটা পরিচিত, এই ঐতিহাসিক ঘটনাবলী পরিপূর্ণ খুরদার সহিত ততটা পরিচিত নই।

খুরদা যে একদিন হিন্দুরাজধানী ছিল; একথা খুরদার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া মনে হয় না। যেখানে পূর্ব্বে নগর ছিল এখন সে স্থানটী পরিত্যক্ত হইয়া পড়িয়া আছে। স্থানে স্থানে জঙ্গল হইয়া গিয়াছে। সেই সকল স্থানে গমনাগমন করিতে বিশেষ আশঙ্কা হয়, কারণ কালের কঠিন আঘাতে সে রম্য উদ্যান নাই, সে রাজপ্রাসাদ নাই; সে সৌন্দর্য্যময়ী নগরও নাই, আছে কেবল রাশি রাশি ভগ্নস্তূপ আর অশ্রুপূর্ণ নয়নের মত সহস্র সহস্র কূপ।

আমরা ধীরে ধীরে মন্দিরের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলাম। মন্দিরের সম্মুখে দুইজন উড়িয়াব্রাহ্মণ তখন বসিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন। হঠাৎ শিকার দেখিলে ব্যাঘ্র যেমন প্রথমটা স্তম্ভিত হইয়া যায় ইহারাও তেমন প্রথমটা সহসা সেই নির্জ্জন পাহাড়ে আমাদের নিরীক্ষণ করিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। পরে যাত্রী বুঝিয়া বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া আমাদের অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহারাই মন্দিররক্ষক ও পুরোহিত। মন্দিরে গিয়া পূজা দিলাম, দেখিলাম দুইটী স্ত্রী-মূর্ত্তি পাশাপাশি। একজনের নাম বরুণা, অপরের

নাম করুণা। মূর্ত্তির চরণের নিম্ন হইতে একটী সূক্ষ্ম নালা, তাহা হইতে স্বচ্ছ বারিরাশি নির্গত হইতেছে। মন্দিরটি খুব ছোট, ভিতরে অত্যন্ত অন্ধকার। ব্রাহ্মণ প্রদীপ জ্বালিলেন। স্থানটি জন-কোলাহল শূন্য, নির্জ্জন, নিস্তব্ধ ও মনোরম।

পাণ্ডা এই মন্দির সম্বন্ধে অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব কাহিনী বর্ণনা করিলেন। তারপর বলিলেন "এই পর্ব্বত বড় সামান্য নয়। এইখানে পঞ্চপাণ্ডব অজ্ঞাতবাস করিয়াছিলেন। পাহাড়ের উপরে তাঁহাদের সেই সকল গুহা আজও বিদ্যমান রহিয়াছে। যে শমীবৃক্ষে পাণ্ডবেরা তাঁহাদিগের অস্ত্রাদি লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন; সেই বৃক্ষ অদ্যাপি এই পাহাড়ের উপর বর্ত্তমান রহিয়াছে। যদি দেখিতে ইচ্ছা করেন, ত এখনি দেখিতে পারেন।"

পাণ্ডার কথা তখন তর্কের দ্বারা উড়াইয়া দিবার মত কোনও যুক্তি খুঁজিয়া পাইলাম না। মেদিনীপুরের নিকট অনেকে বলেন বিরাট রাজার গো-গৃহের নিদর্শন আজও রহিয়াছে। তখন এই পর্ব্বতে যে পাণ্ডবেরা অজ্ঞাতবাস না করিয়াছিলেন, তাহা কেমন করিয়া অবিশ্বাস করি। হয় ত এখানে তাঁহারা অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য ও অবস্থান করিয়াছিলেন। পাণ্ডার সহিত অনেকদূর পর্য্যন্ত উপরে উঠিলাম কিন্তু ক্রমেই নিবিড় জঙ্গল, আর ঘন অন্ধকার। সূর্য্যের আলো বোধ হয় মধ্যাহ্নেই প্রচুর পরিমাণে সেখানে প্রবেশ করিতে পারে না। তখন বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। পাণ্ডাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "আর কত দূর?" তিনি উত্তর করিলেন "আরও অনেক উঁচুতে উঠিতে হইবে। আপনারা বড় বিলম্ব করিয়া আসিয়াছেন।"

আমরা বলিলাম "তবে থাক, আর একদিন সকাল সকাল আসিব।" সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তাঁহাকে দক্ষিণা দিয়া সেখান হইতে

বর্ত্তমান খুরদা সহরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানে Excise Inspector শচীন্দ্রবাবুর বাসায় গিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া খুরদারোডের জন্য যাত্রা করিলাম। খুরদা একটী সবডিভিসন্, আদালত, জেলখানা-হাঁসপাতাল ইস্কুল, থানা প্রভৃতিতে সুশোভিত। রাস্তা ঘাট খুব সুন্দর। এখানকার জল বায়ু খুরদারোড অপেক্ষা ভাল, পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কারণ এখানকার অধিবাসীরা ঝরণার জল পান করিয়া থাকেন। খুরদার ভিতর দিয়া "গঞ্জম" রোড মাদ্রাস অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। খুরদাটি বেশ ছোট খাট সহর। সন্ধ্যার অল্প পরেই গো-যানে আরোহণ করিলাম। তখন আকাশ ঘন মেঘাচ্ছন্ন। পাহাড়গুলি সেই মেঘের মধ্যে আত্মসমর্পন করিয়াছে। ভয়ে ভয়ে, রাত্রি দশটার সময় খুরদারোডে বাসায় আসিয়া পৌছিলাম। তখন দেখি গৌরী আমাদের জন্য বাহিরের ঘরে বসিয়া আছে। আমাদের দেখিয়া সে বাড়ার ভিতর সংবাদ দিতে দৌড়াইল। গৌরীর জন্য ঠাকুরের ফুল ও সিন্দুর আনিয়াছিলাম। সে খাবার অপেক্ষা নির্ম্মাল্য ও সিন্দুর অত্যন্ত আগ্রহভরে মাথায় ছোয়াইয়া গ্রহণ করিল। মনে হইল, গৌরী "এযে তোমার পূজা মা, তুমি নিজেই করিলে" এই ছোট মেয়েটি যেন ইহাদের প্রবাসবাসের আনন্দ-আলোক।

চক্রধরপুর

বেড়ানোর নেশাটা, আমার বাল্যকাল হইতেই আছে বলিলেই হয়। সে আজ প্রায় আট বৎসর অতীত হইল এক দিন ৺পূজার কিছু পরে বাড়ীতে বসিয়া আছি, মনে বড় সুখ নাই। সঙ্গী অভাবে সে বৎসর কোথাও বেড়াইতে যাওয়া হয় নাই। মন ফস্ ফস্ করিতেছে। সহসা খেয়াল চাপিল, আর অযথা অলসের মত বসিয়া বসিয়া সময় কাটানো ভালো লাগে না, যে খানে হোক্ এক দিকে যাওয়া যাক্। তার পরদিন, বেলা বারোটার সময় বাড়ী হইতে রওনা হইলাম। তখনকার দিনে বেলা দেড়টার সময় বম্বেমেল ছাড়িত। আমার কেমন স্বভাব পূর্ব্ব হইতে কোথায় যাইব, তাহার বড় ঠিক করিতে পারি না। সুতরাং ষ্টেশনে আসিয়া অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া 'পুরুলিয়ার' একখানি টিকিট কিনিলাম। আসবাবপত্তর গুলি লইয়া গাড়ীতে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। 'খড়্গপুর' পর্য্যন্ত আমার পূর্ব্বে দেখা ছিল। বিশেষ নূতন বলিয়া মনে হইল না। মান্দ্রাজমেলের মত এ গাড়ীতে যদিও উড়িষ্যা-যাত্রীদিগের ঠেসাঠেসি বা ঠেলাঠেলি হয় না, তবে মারাট্টা, তেলুগু, সাঁওতালী, নাগপুরীর ভিড় যে কম হয় তাহাও নয়। মান্দ্রাজ-মেলের আরোহীদিগের কথোপকথন তবু কতকটা বুঝিতে পারা যায়—বম্বেমেলের আরোহিগণের কথা বিন্দু-বিসর্গ উপলব্ধি করা যায় না। বোবার মত মুখ বুজিয়া, গাড়িতে বসিয়া থাকিতে হয়। ইহাদের ভিতর যাহারা একটু ভদ্র-বেশধারী তাহারা তবু ইংরাজিতে দুই একটা কথা জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া থাকে। খড়্গপুর আসিয়া গাড়ী দক্ষিণ দিকে বাঁকিল। এখান হইতে আর একটি স্বতন্ত্র লাইন

মেদিনীপুর অভিমুখে গিয়াছে। "সাড়দিয়া" "ঝাড়গ্রাম" পার হইবার পর হইতে কেবল সবুজ শাল তরু-শ্রেণীর ভিড় দেখা যাইতে লাগিল। এত নিবিড় শালবৃক্ষের জঙ্গল ইহার পূর্ব্বে আর কোথাও দেখি নাই। যাহা কখন দেখা থাকে না, তাহা যখন প্রথম দেখা যায়, তখন সে দ্রষ্টব্য যদি সামান্য বা সাধারণ হয় তথাপি কেমন হৃদয়-মন হরণ করে। শালবনের মধ্যে প্রাচীন বৃক্ষ বড় দৃষ্ট হইল না। অনেকস্থলের জঙ্গল প্রায় পরিষ্কার করা হইয়াছে। রাশি রাশি বৃক্ষ কাটিয়া কোথাও বড় বড় স্তূপ করিয়া রাখা হইয়াছে। এ অঞ্চল হইতে কাঠ নানা দিকে চালান দেওয়া হয়। কাঠের ব্যবসা করিয়া বেশ দুই পয়সা উপার্জ্জন করা যায়।

ঝাড়গ্রামের পর হইতে পথটি বড়ই পর্ব্বতময়। রেলের দুই ধারে কেবল পাহাড়, আর বড় বড় ঘন অরণ্য। গাড়ী ঘাটশিলার নিকটবর্ত্তী হইতেই সন্ধ্যা হইয়া আসিল। সেই প্রদোষের প্রশান্ত-দৃশ্য, আজও যেন সেদিন দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয়। গাড়ী উদ্দাম-গতিতে ছুটিয়াছে—পর্ব্বতগুলিও যেন রেশারিশি করিয়া সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়াছে, মাঝে মাঝে পর্ব্বতশ্রেণী দূরে পিছাইয়া পড়িতেছে, আর ঘন-শ্যামল নিবিড়-তরু-শ্রেণী তাহাদের কোলে ভাসিয়া উঠিতেছে—গগনের সীমায় আবীরের রক্তিম আভা—কোথাও সমতল ভূমি ক্রমে ক্রমে উঁচু হইয়াছে, তাহার উপরকার বৃক্ষরাজিও স্তরে স্তরে ছোট হইতে বড় দেখাইতেছে। মনে হয় কোন সুনিপুন চিত্রকর বা শিল্পী বহু যত্ন-আয়াস অবলম্বনে তাহাদের সুশৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। গাড়ীর শব্দে শিখিনীর দল উড়িয়া তরুশাখায় বসিতেছে—কোথাও দুই একটী সন্ত্রস্ত হরিণ-শিশু দলভ্রষ্ট হইয়া চকিত-দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। এই সকল মনোরম দৃশ্যাবলী অব-

লোকন করিতে করিতে সুবর্ণরেখা অতিক্রম করিয়া 'সিনিসির' কাছাকাছি হইলাম।

গাড়ীতে বসিয়া বসিয়া, পথে, প্রান্তরে সন্ধ্যার আহ্বান অনুভব করিলাম। সমস্ত প্রকৃতি সন্ধ্যাসতীকে সাদরে বরণ করিল। শঙ্খ ঘণ্টা কিছুই বাজিল না—কুল-বধূ প্রদীপ দেখাইল না, তবুও সরলশান্ত জনহীন নিস্তব্ধতার মধ্যে সন্ধ্যা আসিয়া ধরা দিল।

সিনিতে পৌঁছিয়া শুনিলাম আমাকে পুরুলিয়ার জন্য এখানে গাড়ী বদল করিতে হইবে। 'সিনি' ষ্টেসনটি দিগন্তব্যাপী, প্রান্তরের মধ্যে। একজন তেলুগু ষ্টেশনমাষ্টার, একজন 'তার' ও টিকিটবাবু আছে, মনে হইল ইঁহারাই এখানকার সর্ব্বস্ব! কোনও প্রকার অপেক্ষা করিবার মত স্বতন্ত্র ঘর নাই।

প্লাট্‌ফর্‌মের উপর দুইখানি বেঞ্চ, তা ছাড়া আর বড় কিছু দেখিলাম না। জানিলাম পুরুলিয়ার গাড়ী রাত্রি বারটার সময় আসিবে। ততক্ষণ আমাকে এই মুক্ত প্লাটফর্‌মে অপেক্ষা করিতে হইবে। রাত্রি বারোটা পর্য্যন্ত এই ভয়-সঙ্কুল স্থানে অপেক্ষা করিতে সাহসে কুলাইল না।

ষ্টেশনমাষ্টারকে অনেক অনুনয় বিনয় করিলে রাত্রি বারটা পর্য্যন্ত এরূপ স্থানে অপেক্ষা করাও বিপদজনক বিবেচনা করিয়া তিনি চক্রধরপুর পর্য্যন্ত একখানি টিকিট দিলেন। বলিলেন—"ওখান হইতে রাত্রি সাড়ে আটটা বা নয়টার সময় পুরুলিয়ার গাড়ী ছাড়ে!" ধন্যবাদ দিয়া, টিকিট খানি হাতে লইয়া ছুটিয়া গিয়া সেই গাড়ীতেই পুনরায় উঠিলাম।

গাড়ীতে এই সময় একজন মহারাষ্ট্রীয় ভদ্রলোকের সহিত আলাপ হইল। তিনি রায়পুরের অন্তর্গত কোন একস্থানের জমিদার। লোকটির

ললাটে রক্তচন্দনের তিলক। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, পরিধানে রক্তবর্ণ চেলী। তাঁহাকে দেখিলে বেশ ভক্তি হয়—আলাপ করিতে আপন হইতে ইচ্ছা হয়।

তিনি কথায় কথায় নানা শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে উদাহরণ উদ্ধৃত করিতে ছিলেন। ধার্ম্মিক বলিয়া নিজেকে প্রতিপন্ন করিবার জন্য যে এইরূপ করিতেছিলেন, তাহা কিছুতেই বলিতে পারি না। তাঁহার কথাবার্ত্তায় বুঝিলাম তিনি বেশ ভক্ত। তিনি দেখিতে বেশ সুন্দর, তপ্তকাঞ্চনের মত গৌরবর্ণ, মাথার দুই এক গাছি কেশ শুভ্র হইতে সবে মাত্র সুরু করিয়াছে—তাহা যেন গাঢ় কৃষ্ণ-মেঘের মধ্যে দুই একখানি খণ্ড সাদা মেঘ। তিনি বলিলেন "আমার বয়স একান্ন বৎসর, আজ এক বৎসর যাবৎ নানা তীর্থভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি ; শাস্ত্রে লেখা আছে—পঞ্চাশের পর বনে গমন করাই বিধেয়—কিন্তু আমরা সংসারী জীব তাহা আর পারি কই ? বরং দেখা যায় পঞ্চাশের পর হইতেই সংসারের মায়া অধিক জমাট বাঁধিতে সুরু করে।"

আমি বলিলাম 'সেকথা ঠিক।"

তিনি উত্তর করিলেন "শুধু ঠিক নয়—বর্ণে বর্ণে সত্য—সংসারের সমস্ত 'খুঁটিনাটি' যেন সর্ব্বদিক দিয়াও বার্দ্ধক্যের দৃষ্টি এড়াইতে পারে না। সামান্য তুচ্ছ জিনিসকে, এই সময় বড় করিয়া দেখিবার অবসর বোধ হয় সারা জীবনের মধ্যে আসে।

"আপনি কি করেন ?"

"সামান্য জমিদারী আছে তাহাতেই এক রকম বেশ চলিয়া যায় আমার একটী ছেলে বড় হইয়াছে তাহারই হাতে বিষয়কর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে পঞ্চাশের পর বনে না গিয়া তীর্থে তীর্থে ভগবানের নাম করে ঘুরে বেড়াচ্ছি।"

"কতদিন বাড়ী থেকে বেরিয়েছেন ?"

"এক বৎসর, ইচ্ছা আছে আর দুই বৎসর পরে একবার বাড়ী ফিরিব।"

"আপনি দেখছি এমনি করে করেই মায়া কাটাচ্চেন।"

তিনি নিরুত্তর হইয়া রহিলেন।

অনেকক্ষণ পরে বলিলেন, "আমার মনে মনে একটী সংকল্প আছে কিন্তু তাহা পূর্ণ হইবার কোনো সম্ভাবনা দেখি না ; আমাদের দেশে একটী ছোটখাট বিদ্যালয় স্থাপন করা—সমস্ত ব্যয় ভার বহন করিতে প্রস্তুত আছি, যাহাতে লোকগুলি কিছু লেখাপড়া শিখিতে পারে—একজন বাঙালী পাইলেই বেশ সুবিধা হয়।"

আমি বলিলাম, "সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দিন।"

"এতদূরে কি কেহ আসিতে স্বীকার পাইবেন ?"

"তা সত্য, কিন্তু চেষ্টা করিতে দোষ কি ?"

আজকাল সংসার ত্যাগ করিয়া একা দেশে দেশে আনন্দিত অন্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতে পারে এমন লোক যে আছে ভাবিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। তারপর তাহার সহিত নানা দেশের গল্প হইতে লাগিল—গাড়ীর এই লোকটির কথা সংসারের নিত্য অভাব অভিযোগের মধ্যেও স্মরণ করিলে একটু তৃপ্তি পাই।

রাত্রি আন্দাজ সাড়ে সাতটার সময় চক্রধরপুরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। অপরিচিত স্থান। কাহারও সহিত জানাশুনা নাই। গাড়ীতেও কোন বাঙালী যাত্রী ছিল না ; এখানে অবতরণ করিলে কাহারও সাক্ষাৎ লাভ অদৃষ্টে ঘটিল না। বেশ যেন একটা অভিনব অভিযান হইয়া পড়িল।

'সাহেব সুভোদের' এখানে 'রাত্রি ভোজ' সমাপন হয়। তাঁহারা

আহারে উপবেশন করিয়া কলের পুতুলের মত নীরবে কাঁটা চামচে নাড়িতে লাগিলেন। যাঁহার হস্ত ক্ষিপ্র, গতি-শীল, তাঁহার কাঁটা বা চামচে প্লেটের সংস্পর্শে ঠুং ঠাং শব্দ তুলিতেছিল। বড় আশ্চর্য্যের বিষয় কাহারও মুখে কথাটি নাই, সুশীল বালকের মত যাহা পায় তাহাই খায়। খানসামাগুলিকে ধন্যবাদ দিই—তাহাদের মুখে কথাটী পর্য্যন্ত নাই। পরিবেশন কার্য্যে যে তাহারা অপরিসীম দক্ষতা লাভ করিয়াছে তাহার কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। আমি একজন মেঠাই-ওয়ালার সন্ধানে 'কলম্বস' হইতে কোন অংশে পরিশ্রমের ত্রুটি করি নাই কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কাহারও সাক্ষাৎ মিলিল না।

এই অঞ্চলের লোক গুলির কথাও ছাই বুঝিতে পারি নাই, অনেক কষ্টে এইটুকু বুঝিলাম, বাজার ভিন্ন কোথাও কিছু পাওয়া যায় না। বাজার, ষ্টেশন হইতে এক মাইল পথ। ষ্টেশনের আলো ধীরে ধীরে নিবাইয়া দিল। রেলকর্ম্মচারীরা একে একে স্ব স্ব বাসায় ফিরিল। ষ্টেশনটি বিজয়া-নিশির মত ক্রমে ক্রমে নীরব হইয়া আসিল। লোকজনের কোলাহল মৃদু হইতে ক্ষীণ, ক্ষীণ হইতে ক্রমে ক্রমে আর শ্রুত হইল না। বড়ই ফ্যাসাদে পড়িলাম, কি করা যায় ভাবিতে লাগিলাম।

কণ কণে ঠাণ্ডা হাওয়ায় জমিয়া যাইবার ভয় হইল। এত শীঘ্র শীঘ্র এদিকে যে শীত পড়ে তাহা জ্ঞাত ছিলাম না। কি মুস্কিলেই পড়িলাম। জিনিষপত্র লইয়া এখন যাই কোথায়? আমার পক্ষে পুরুলিয়া ও চক্রধরপুর উভয়ই সমতুল; কারণ কোনোস্থানেই কেহ আমার আগমনকে আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষা করিতেছিল না। অতএব এ রাত্রিতে পুরুলিয়া গিয়াই বা লাভ কি?

চক্রধরপুর ষ্টেশনের প্ল্যাটফরমটি দীর্ঘে প্রায় অর্দ্ধ মাইল হইবে।

চারিদিকে প্রকাণ্ড তরুরাজি। বৃক্ষগুলি দুই চারি বর্ষের নয়। তাহাদের—অনুমান হয়—বয়স অনেক হইয়াছে। ষ্টেশনটি আধুনিক। যে তরুগুলি সমশ্রেণীভুক্ত হইয়া প্ল্যাটফর্মে থাকিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছে, তাহারাই নূতনের বক্ষে পুরাতনের সম্বন্ধকে দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। যথার্থই নূতনের কোলে এই পুরাতনগুলিকে বড় সুন্দর মধুর বোধ হইল। বিছানাপত্র টানিয়া একখানি বেঞ্চের নিকট হাজির করিলাম। মনে হইল, এবারকার যাত্রাটা বড়ই অশুভ! এই সময় পুরুলিয়ার গাড়ী আসিয়া প্ল্যাটফর্মে লাগিল। তাহা একখানি মালগাড়ি বলিলে অত্যুক্ত হয় না। দুইখানি মাত্র তৃতীয়শ্রেণীর গাড়ী ইহার সঙ্গে সংযুক্ত করা হইয়াছে—তাহাতে আবার সে দিন গাড়িতে মোটেই আলো ছিল না। আমার কেমন পুরুলিয়া যাইতে মন সরিল না। গাড়ী যথাসময়ে ছাড়িয়া দিল। তখন অন্ধকার ও পাহাড় এক হইয়া গিয়াছে।

এই সময় দেখিলাম একটি ভদ্রলোক লণ্ঠন হাতে করিয়া প্ল্যাটফরমের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন। তিনি ষ্টেশনে আসিয়া পার্শেল আপিসের দিকে গেলেন! বোধ হইল তিনি বাঙালী। কিন্তু অন্ধকারে মুখখানি ভাল দৃষ্ট হইল না। ভাবিলাম আজ ইঁহারই অতিথি হওয়া যাক্। তিনি বাহিরে আসিলে, অমনি তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনি কি রেলে কর্ম্ম করেন?" "না" বলিয়া তিনি লণ্ঠন উঁচু করিয়া আমার মুখের উপর ধরিতেই আমি বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলাম, "একি বিনোদ নাকি?"—"তুমি এখানে?

"মেলে এসেছি, কিন্তু তুমি এখানে আছ, তাতো জানি না।"

মনে মনে ভাবিলাম এ যেন ঠিক উপন্যাস হ'য়ে গেল। কিন্তু অনেক সময় বাস্তব ও সত্য এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে আসিয়া পরস্পর দেখা দেয় যে, তাহা সত্য হইলেও লোকের মনে উপন্যাসের মত কল্পিত দৃশ্যই জাগাইয়া তোলে।

শুনিলাম সে কোনো ইংরাজ কোম্পানির গালার কারখানার ছোট বাবু। এখানে আজ ছয় মাসাধিক কাল অবস্থান করিতেছে।

রেলওয়ের একটি কুলীর মাথায় সমস্ত জিনিসপত্র দিয়া তাহার সমভিব্যহারে বাসায় চলিলাম। পথে যাইতে যাইতে বিনোদ নানা-প্রকার প্রশ্ন করিতে সুরু করিল। ষ্টেশন হইতে তাহার বাসা প্রায় এক মাইল দূর। রাত্রিতে এখানে বড় লোকজন চলে না। দূরে সাহেবদের বাংলায় আলো জ্বলিতেছে—তাহার রশ্মি বাতায়নপথ দিয়া গাছের মাথায়, কোথাও বা পথের উপর আসিয়া পড়িয়াছে।

ষ্টেশন হইতে রাস্তাটি বেশ সরল ও সুন্দর। দুই ধারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষরাজি। বিনোদ সহসা বলিয়া উঠিল—"ওহে এখানে বড় সাপের উপদ্রব, প্রায় সকালে বেড়াতে আসিয়া দেখি, পথের উপর কত সাপ গাড়ীর চাকার চাপে মরিয়া আছে। আর এক প্রকার "বিচ্চু" দেখা যায়, সে গুলি একবার দংশন করিলে জীবনের আশা থাকে না।"

আমি বলিলাম "বল কি? এমন স্থানে তোমরা কেমন ক'রে রয়েছ?" বিনোদ হাসিয়া কহিল "উদরের জ্বালায়। নইলে এ বনবাসে আর কার সাধ। দেশের গুণ কত, তরিতরকারি ত কিছুই পাওয়া যায় না। আলু একটা উপাদেয় আহার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে—তাহাও দুর্ম্মূল্য।" সাপের কথা শুনিয়া মন অত্যন্ত খারাপ হইয়া গেল। চলিতে যেন বাধো বাধো ঠেকিতে লাগিল।

প্রতিমুহূর্ত্তেই মনে হইতেছিল এইবার বুঝি সাপের ঘাড়ে পা দিলাম। এতক্ষণ বেশ যাইতেছিলাম কিন্তু সাপের উপদ্রব শুনিবার পর হইতে আতঙ্কে ও আশঙ্কায় চরণ জড়াইয়া আসিতেছিল।

বাসায় পৌঁছিয়া হাঁপ্ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। বিনোদের বাসা গালার কারখানার মধ্যেই। এই কারখানার অল্প দূরে তখন অন্ধকাররাশি জমিয়া আকাশ পর্য্যন্ত গিয়া ঠেকিয়াছে। অনুসন্ধানে জানিলাম ওটি একটি পাহাড়। সে রাত্রি আহারাদির পর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত গল্প চলিল। প্রভাতেই বেড়াইতে যাইতে হইবে। সুতরাং সকালে সকালে শয়ন করিলাম।

খুব সকালেই আমার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। বাহিরে আসিয়া প্রভাতে প্রথম যে দৃশ্য অবলোকন করিলাম তাহা বর্ণনা করা এক প্রকার অসম্ভব। চতুর্দ্দিকে কালো কালো পাহাড় শ্রেণীবদ্ধ ভাবে চলিয়া গিয়াছে, এই স্থানটিকে যেন পর্ব্বতমালা চক্রাকারে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। তাহাদের মস্তকের উপর নীল নির্ম্মেঘ অনন্ত আকাশ চন্দ্রাতপ রূপে শোভা সম্পাদন করিয়াছে। মধ্যে এই সমতল ভূমিটি প্রকৃতির প্রাঙ্গণ বা রঙ্গভূমি বলিয়া মনে হইল। বেশ স্নিগ্ধ বাতাস আসিতেছিল—জনকোলাহলবিহীন স্থানটি পক্ষিকুলের মধুর প্রভাতী গানে মুখর হইয়া উঠিয়াছিল। অদূরে সাহেবদের বাংলাগুলি যেন ছবির মত সুন্দর দেখাইতেছিল। আজিকার প্রভাত যেন সর্ব্বদিক হইতে আমাকে স্নেহ-কোমল আকর্ষণে প্রকৃতির শান্তি-পূর্ণ-বক্ষে টানিতেছিল—আজিকার জাগা অনেকদিনকার নিদ্রাঘোর আচ্ছন্ন আঁখিতে নূতন দৃষ্টিশক্তি আনিয়া দিল। আকাশে, বাতাসে, মেঘে, পাহাড়ে, বৃক্ষে, লতায় চারিদিকে প্রভাত আপনার পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য লইয়া জাগিয়া

উঠিয়াছে। এই মনোহর দৃশ্য নিরীক্ষণ করিলে স্বভাবতঃই মনে অপূর্ব্ব হর্ষ, আনন্দ, বল ও শক্তি সঞ্চারিত হইতে থাকে। দেখিতে দেখিতে মুগ্ধ হইয়া গেলাম। এই সময় প্রায় দুইশত কোল নারী ও পুরুষ সেই গালার কারখানার মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। পুরুষদের গাত্র অনাবৃত। জানুর উপর হইতে একখানি কৌপীন অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বড় বস্ত্র লজ্জা নিবারণ করিতেছে। তাহাদের মস্তকের কেশ তৈলহীন, রুক্ষ—বক্ষ ও বাহু বিশাল ও বলিষ্ঠ। কাহারও কাহারও কাণে ছোট ছোট কর্ণাভরণ। কাহারও কাহারও গলায় পুঁথির মালা। রমণীদের পরিধেয় বস্ত্র পুরুষদের অপেক্ষা কিছু বড়; কোনোমতে বক্ষের উপর পর্য্যন্ত আসিয়াছে। তাহারা মাথায় কাপড় দেওয়ার মধ্যে লজ্জার কোনো গতিবিধি দেখিতে পায় না। সকলের হাতে প্রায় কাচের চুড়ী, কাণে কাহারও কাহারও সোনার দুল। অধিকাংশই কাচের নীল, সবুজ দুলেই সম্পূর্ণ সুখী বলিয়া মনে হইল। তাহাদের ভিতর বড় লজ্জা দেখিলাম না। স্বামী-স্ত্রীতে উভয়েই মজুরী করিতে আসিয়াছে। শুনিলাম, স্ত্রী লোকেরা পুরুষদের অপেক্ষা অধিক পরিশ্রম করিতে সক্ষম, তাহাদের "রোজ" পুরুষদের অপেক্ষা কিছু বেশী। তাহারা চোর নয়। অত্যন্ত সরল ও বিশ্বাসী। বিনোদ আসিয়া ইহাদের হাজিরা লইতে আরম্ভ করিল! যখনকার কথা বলিতেছি তখন সবেমাত্র বৎসরাধিককাল কুঠী হইয়াছে। তাহাদের নামগুলি প্রায় হিন্দু-দেবদেবীর নাম লইয়াই। কামিনী, পার্ব্বতী, ইন্দিরা, লক্ষ্মী—পুরন্দর গণেশ, কার্ত্তিক, কুবের ইত্যাদি। একধারে রমণীরা সার দিয়া দাঁড়াইল, অপর পার্শ্বে পুরুষগুলি শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। এইরূপ প্রথা তাহারা এই কুঠীর সংস্পর্শেই শিক্ষালাভ করিয়াছে। যখন

নাম ডাকা আরম্ভ হইল তখন আমি হাস্য সংবরণ করিতে পারিলাম না। কেহ বলিতেছিল "উপা" কেহ অনেক কষ্টে "উপথি" পর্য্যন্ত বলিয়া পরিত্রাণ লাভ করিতেছিল। কেহ বা এই এক বৎসরের ভিতর কথাটি এখনও ভাল করিয়া মাথায় আনিতে পারে নাই সুতরাং সেইরূপ লোকদের পালা আসিলেই তাহারা অধরোষ্ঠ নাড়িয়া সারিয়া দিতেছিল। বুঝিলাম তাহাদের চাকরীর মধ্যে যদি কিছু কঠিন ও কষ্টকর থাকে, তবে এই "উপস্থিত" "অনুপস্থিত" বলার মধ্যেই। হাজিরা লওয়া হইলে তাহারা স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কাজে গিয়া যোগ দিল।

প্রাতরাশ সমাপন করিয়া বেড়াইতে বাহির হইলাম। Factory হইতে অল্প দূরেই ষ্টেশনের রাস্তাটি। এই রাস্তাটি বরাবর "চাঁইবাসা" গিয়াছে। "পুস্ পুস্" বা ঘোড়ার গাড়ির সাহায্যে চাঁইবাসা গমনাগমন করিতে হয়। এখান হইতে চাঁইবাসা পনেরো মাইল দূর। রাস্তার দুই ধারে পাহাড় আর জঙ্গল। পথে বাহির হইয়া দেখিলাম—ক্ষেত্র সকল শস্য-শ্যামল। জমির উর্ব্বরা-শক্তি খুব বেশী বলিয়া প্রতীয়মান হইল। এক খণ্ডও পতিত জমি নয়নগোচর হইল না। সকল জমির উপর সুন্দর ফসল হইয়াছে। অধিকাংশই ধানের চাষ। অনেক রকম অরণ্য-পুষ্প দৃষ্টিগোচর হইল। পথের পার্শ্বে এই সকল ফুলের গাছ—কাহারো যত্নে তাহারা এমন করিয়া বর্দ্ধিত হয় নাই—কাহারো কোমল-করে বেদনা দিয়া আপনাদের পুষ্টি ও সৌন্দর্য্য সঞ্চয় করিতে, জল সেচন আশায় লালায়িত হয় নাই। পথের পাশে পথিকের ক্লান্তি অপনোদন করিতেই যেন অযত্ন-বর্দ্ধিত পুষ্পগুলি পরিপূর্ণ সৌরভে প্রস্ফুটিত হইয়াছে! এই ফুল গুলিকে আমার বড় মধুর লাগিয়াছিল। কোল রমণীদিগের বেণী-বন্ধ

অলকে অলোকার সুখ-সম্পদ ও শোভা-সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলিতেই বুঝি পর্য্যাপ্তপরিমাণে তাহারা এ অঞ্চলে অযাচিত ভাবে জন্মাইয়া থাকে। কোল পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা ফুল বড় ভালবাসে। অনেক সময় তাহারা কুসুমের ভূষণ ধারণ করিয়া থাকে। তাহাদের নিকট ফুলের কোন প্রকার জাতি বা গৌরব বিচার নাই, ফুল হইলেই হইল। জবা ফুলের পার্শ্বে গোলাপ সমান আসনে সমান আদর পাইয়া থাকে।

সেদিন আমি একটি নদীর ধার পর্য্যন্ত বেড়াইয়া বাসায় ফিরিলাম। তখন বেশ রৌদ্র উঠিয়াছে—পাহাড়গুলির অঙ্গে ধোঁয়ার মত ছায়া পড়িয়াছে। এই অবস্থায় পাহাড়ের কোন অংশের বৃক্ষলতাদি বেশ সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়, আর কোন অংশ ছায়া-সমাচ্ছন্ন হইয়াও বেশ সুন্দর দেখায়।

বিনোদ আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। সে বলিল,—"চল নদীতে স্নান করে আসি, তা হ'লে তোমার নদী দেখাও হবে।"

আমি বলিলাম "নদী পর্য্যন্ত ঘুরে এসেছি; কাল তখন আবার যাওয়া যাবে।"

মধ্যাহ্নে কোনো দিনই আমি শয়ন করি না। তত রৌদ্রেও কোথাও বাহির হইতে পারিলাম না। বৈকালে বেড়াইতে যাওয়ার বন্দোবস্ত স্থির হইল। আমি গালা প্রস্তুত দেখিতে কারখানার মধ্যে প্রবেশ করিলাম। এক প্রকার 'গাছের 'আঁটা'র সহিত অন্য কতকগুলি দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া গালা প্রস্তুত হইয়া থাকে। প্রথমে এই 'আঁটাগুলিকে একটি প্রকাণ্ড টবে ভিজাইয়া রাখা হয়। তার পর সেগুলিকে খুব পরিষ্কার করিয়া ধৌত করা হইলে, তাহা হইতে কাঠি কুটা ও কাঁকর বাছিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়। তাহার পর

মির্জ্জাপুর নিবাসী কারিকরগণ গালার প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণী অনুযায়ী মশলা মিশাইয়া গালা তৈয়ার করিয়া থাকে। গালা উত্তম শ্রেণীর কি মধ্যম শ্রেণীর হইবে তাহা এই 'আঁটা'র প্রকৃতি দেখিয়াই কারিকরগণ নিরূপণ করিতে পারে। আঁটা জঙ্গল হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিতে হয়। ৪০৲ টাকা হইতে ৭০৲ টাকা পর্য্যন্ত মণ দরে আঁটা বিক্রয় হইয়া থাকে। কারিকরগণও খুব পুষ্ট বেতন পাইয়া থাকে। এই সকল গালা জার্ম্মানী প্রভৃতি দেশে রপ্তানী হয়। শুনিলাম এই ব্যবসায়ে অত্যন্ত লাভ। গালা প্রস্তুত-প্রণালী দেখিতে বড়ই চিত্তাকর্ষক। বেলা চারিটার সময় সকলের ছুটী হইয়া গেল। একজন বৃদ্ধা আসিয়া একটী যুবককে বলিল, "দেলা জুমে মাড়ি জুমতানা।" সে বিনা বাক্যব্যয়ে তাহার সহিত প্রস্থান করিল। যাইবার সময় নত-নয়নে অনুমতি ভিক্ষা করিল। আমি অপর একজন সর্দ্দারকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"ইহার অর্থ কি?" সে বলিল "ভাত প্রস্তুত হয়েচে আহার করবে এস।" তাহাদের কথোপকথন শুনিতে বড় ভালও লাগে। বৈকালে বেড়াইতে বাহির হওয়া গেল। একজন ভৃত্য লণ্ঠন হাতে করিয়া আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

এখানকার বাজার খুব ছোট। দেখিবার মত কিছুই নাই। খান কয়েক ঘরে ব্যবসায়ী হিন্দুস্থানীদের দোকান। তাহারা যে কোন্ স্থানে নাই তাহা বলিতে পারি না! বাজারে দুইখানি খাবারের দোকান। তাহাও হিন্দুস্থানীদিগের; তবে দোকানের শ্রী নাই। খাবার গুলির উপর একটা পুরু ধূলির স্তর পড়িয়াছে।

একখানি বিশ হাত লম্বা চালা—তাহাতেই বাজার বসে। যাহারা বাজারে জিনিষপত্র বিক্রয় করিতে আনে তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই স্ত্রীলোক। কাঁকরোলই দেখিলাম তরি-তরকারীর উচ্চ

সিংহাসন খানি অধিকার করিয়া একাধিপত্য করিতেছে এবং একমাত্র অনায়াসলভ্য। চক্রধরপুরে গালা, চাল, সরিষা, রেশম, কাষ্ঠ, চর্ম্ম প্রভৃতি দ্রব্য সমূহ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

এ অঞ্চলের পাহাড় ও জঙ্গলগুলি গভর্ণমেণ্টের 'খাসমহল।' কমিশনারের বিনানুমতিতে কেহ এই সকল পাহাড়জঙ্গলে শিকার করিতে পারে না। শুনিলাম এই সকল পর্ব্বত-প্রদেশে শিকার অভিযান করিতে গিয়া অনেক ইংরাজ কর্ম্মচারী অকালে প্রাণ হারাইয়াছেন।

চক্রধরপুরে দুই চারিজন বাঙালী ব্যতীত আর বাঙালী নাই! স্থানটীর জল বায়ু অত্যন্ত সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর। লোকে অনায়াসে এই স্থানটীকে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য নির্দ্দেশ করিতে পারেন! বোধ হয় এই স্থানটী অধুনা জনকোলাহলপূর্ণ মধুপুর প্রভৃতি অঞ্চল অপেক্ষা খুবই ভাল।

বাজার দেখিবার পর আমরা রাজ-বাটী দেখিবার নিমিত্ত চলিলাম। বাজারের সম্মুখের পথ দিয়াই রাজ-বাড়ী যাইতে হয়। অল্পদূর আসিয়া দেখিলাম একটি অল্পপরিসর নদী; তাহার উপর একটি ক্ষুদ্র সেতু—সেতুটী বাঁশের নির্ম্মিত। সেতুর পরপারেই রাজপ্রাসাদ! এই স্থানটী 'কেরাই' নামে অভিহিত। এখানকার লোকে চক্রধরপুরের রাজাকে 'কেরাইরাজ' বলিয়া থাকে।

রাজ-প্রাসাদ দেখিবার নিমিত্ত যে আগ্রহ ও কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইয়াছিল দূর হইতে রাজ-বাড়ী অবলোকন করিয়া তাহা নিবৃত্ত হইয়া গেল! গগনস্পর্শী সৌধ-চূড়া নাই, ক্রোশ-ব্যাপী গড়ও নাই, রাজ-প্রাসাদোপযোগী নহবৎখানা নাই, দ্বারে বন্দুক স্কন্ধে প্রহরী পাহারায় নিযুক্ত নাই, রাজৈশ্বর্য্যের কোন লক্ষণ সেখানে পরিলক্ষিত হয় না।

কেহ ইহাকে রাজ-বাড়ী বলিয়া নির্দ্দেশ না করিয়া দিলে ইহার নিজের এমন কোনো আকর্ষণ নাই যে দৃষ্টি আবদ্ধ করিতে পারে। ইহা সামান্য একখানি গৃহস্থের বাড়ীর ন্যায়। কোনো প্রকার বিশেষত্ব বা জাঁকজমক নাই।

শুনিলাম কিছু দিন পূর্ব্বে এই রাজ্যের মধ্যে একটী সোনার খনি বাহির হইয়াছিল এবং রাজাকে অবলম্বন করিয়া একটী যৌথ কারবার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কত লোক ভবিষ্যৎ উন্নতির আশায় সেই কোম্পানীর অংশ ক্রয় করিয়া অবশেষে রাংও পায় নাই। অদৃষ্টকে ফাঁকি দিয়া যাঁহারা শীঘ্র বড়লোক হইবার অভিপ্রায়ে প্রথমে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহারা পরে চক্রধরপুরের উপর নিশ্চয়ই অভিসম্পাত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

বাসায় ফিরিয়া আসিবার সময় রাস্তার দুই একটা চক্‌চকে পাথর কুড়াইলাম। বিনোদ জিজ্ঞাসা করিল "ও গুলো আবার কি হবে?।"

আমি বলিলাম—"যদি সোনার খনির দেশে দুই একটা হীরা মাণিক পে'য়ে যাই তো আর দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হবে না।"

বিনোদ বলিল "পকেটে রাখছ ভাল করচ না; অতি লোভে শেষে সুপারি মনে করে দাঁত ভেঙো না।"

পরদিন চাঁইবাসা যাইবার পথে বেড়াইতে চলিলাম। সে দিন আমি একাই বাহির হইলাম। এই পথে প্রায় দুই মাইল অগ্রসর হইতেই একটা লৌহনির্ম্মিত সেতু দেখিতে পাইলাম। এই সেতুটী পর্ব্বতের বক্ষের উপর। ইহার উপর দিয়া গাড়ী, ঘোড়া, পুষপুষ প্রভৃতি যাতায়াত করে।

এই স্থানটী অতি নির্জ্জন ও মনোরম। দুই দিকে উচ্চ পাহাড়। পাহাড়ের বক্ষ ভেদ করিয়া এই পথ চাঁইবাসা অভিমুখে গিয়াছে।

একটি নির্ঝর এইখানে তুমুল সংগ্রাম বাধাইয়াছে—সে দক্ষিণ হইতে উত্তরে যাইবার মানসে নিভৃত নির্জ্জন পর্ব্বত-গুহা হইতে উদ্দাম গতিতে ছুটিয়া বাহির হইয়াছে বটে, কিন্তু সম্মুখেই প্রকাণ্ড পাহাড় তাহার গতিরোধ করিয়াছে, সুতরাং সে এখানে অত্যন্ত মুখর হইয়াছে! কি বিপুল জলোচ্ছ্বাস! কি গভীর আর্ত্তনাদ! নির্ঝর যেন স্থির সংকল্প করিয়াছে—পর্ব্বত-কারা ভাঙ্গিয়া আজ গন্তব্য-পথে যাইবেই যাইবে। ভাবিলাম নির্জ্জনের লোক বাহিরে আসিলে কি এমনি গোল করিতে হয়? চির অন্ধকার-কারায় অবস্থান করিয়া আলোকের সংস্পর্শে আসিলে কি এমনি উদ্ভ্রান্ত হইতে হয়? বন্দী মুক্তি পাইলে কি এমনি উতলা ও উদ্দাম হইতে হয়?

পাহাড়ের বক্ষের উপর কখনও এমন অবস্থায় নির্ঝরিণীর সাক্ষাৎ পাই নাই। তাই আজ এই ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী নিরীক্ষণ করিয়া—হৃদয় পুলক-আনন্দে নাচিয়া উঠিল! কত কথাই মনে আসিতেছিল। দক্ষিণের পাহাড় হইতে সে এখানে নামিয়াছে, কিন্তু কিছু দূর আসিয়াই সে দেখিয়াছে সম্মুখে বিশাল পর্ব্বত।

"পথ নাই, পথ নাই" বলিয়া পর্ব্বত যেন গিরি নির্ঝরিণীকে গৃহে ফিরিয়া যাইতে বার বার অনুরোধ করিতেছে! কিন্তু সে, এই কথায় কর্ণপাত করিতেছে না। তাহার প্রতিশব্দে যেন ধ্বনিত হইতেছিল।

"ভাঙ্গরে হৃদয় ভাঙ্গরে বাঁধন,
সাধরে আজিকে প্রাণের সাধন,
লহরীর পথে লহরী তুলিয়া
আঘাতের পরে আঘাত কর্!

মাতিয়া যখন উঠেছে পরাণ,
কিসের আঁধার কিসের পাষাণ,
উথলি যখন উঠেছে বাসনা,
জগতে তখন কিসের ডর !"

এই সময় দেখি, আমাদের বাসার সর্দ্দার ইন্দ্র একটা ছাগশিশু কোলে লইয়া সেই পথে আসিতেছে, সে যেন আমাকে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল। ইন্দ্রের সম্বন্ধে এখানে দুই একটি কথার উল্লেখ না করিলে একটি পবিত্র প্রণয়-কাহিনী পাঠকপাঠিকাদিগের নিকট অজ্ঞাত থাকিয়া যাইবে।

আমাদের কারখানায় কামিনী কাজ করে; কামিনীকে ইন্দ্র ভাল বাসে; বিবাহ করিতে চায়, কিন্তু কামিনী তাহাকে এমন ভাব দেখায় যে, সে তাহাকে মোটেই দেখিতে পারে না—সে তাহাকে চায় না; তার কথা শুনিলে জ্বলিয়া উঠে—ছায়া দেখিলে লাফাইয়া সরিয়া যায়। ইন্দ্র এই সকল জানিয়া আরও তাহার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। বিনোদ ইন্দ্রকে বুঝাইয়াছ যে,—"তুই এই নূতন বাবুকে পাকড়া, তা হ'লেই তোর বাসনা পূর্ণ হবে।" তাই নাকি সে আমার পূজার জন্য পাঁটা সংগ্রহ করিয়াছে! আমি তাহাকে আশ্বাস দিয়া বাসায় ফিরিলাম। তাহার জন্য সত্যসত্যই প্রাণে ব্যথা লাগিয়াছিল। কারণ লোকটা বড় ধর্ম্মভীরু ভাল মানুষ। বাসায় বসিয়া বিনোদকে বলিলাম,—"এ আবার কি হয়েছে ?" বিনোদ হাসিয়া বলিল, "ও লোকটা বিয়েপাগলা হয়ে গেছে। কামিনীকে বিবাহ করিবার জন্য ওকে যা-কিছু করতে বলবে, ও দ্বিরুক্তি না করে তাই করবে। এমন ধারা তো বাবা গরীব লোকের ভিতর কখনো দেখি নেই।"

আমি হাসিয়া বলিলাম "প্রণয়ের রীতি সর্ব্বত্রই এক রকম। বড়

লোকের বা ভদ্র লোকের জন্য রতি-পতিকে স্বতন্ত্র বা নূতন শর যোজনা করিতে হয় না, সে একই শর, একই সন্ধান, একই প্রয়োগ !"

কামিনীকে সে দিন বৈকালে ডাকিয়া পাঠাইলাম। সে অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত আমার সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলে আমি বলিলাম "তুমি ইন্দ্রকে এখানে ডেকে আনো।"

সে মৃত্তিকার প্রতি নতদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, নড়িল না।

আমি মনে মনে সকলই বুঝিলাম, পুনরায় বলিলাম,"ইন্দ্রকে ডেকে আনো।" এবার সে ছল ছল নেত্রে উত্তর করিল, "তাহার সহিত কথা বলবো না।"

"কেন ?"

তাহার গণ্ডস্থল লাল হইয়া উঠিল। "সে বলিল.—সে কেন আমায় বিয়ে করতে চায় ?"

"বিবাহে কি তোমার মত নাই ?"

"আমার বাবাকে না বলে' কেন আমাকে বলে ?—আমি তো বলেছি বাবাকে বলতে।"

এই সুন্দর নীতি-বন্ধনটি অশিক্ষিত জাতির মধ্যে বড়ই মধুর ও প্রাণস্পর্শী বলিয়া মনে হইল।

ইহাদের বিবাহ প্রায় রথের দিনেই প্রশস্ত। বিবাহের অনুষ্ঠানটি দেখিতে বড়ই সুন্দর, অভিভাবকবর্গ দুই দিকে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। বিবাহার্থী কন্যাগণ পরস্পরের হাত ধরাধরি করিয়া বৃত্তাকারে নৃত্য করিতে আরম্ভ করে। সে দিন তাহারা বিশেষ করিয়া ফুল-সাজে সজ্জিত হয়। সর্ব্বাঙ্গে ফুল পরে, কর্ণে দুল দুলাইয়া দেয়। বিবাহার্থী পুরুষগণ তীর ধনুক লইয়া যাত্রার দলের রাম লক্ষ্মণের মত এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া এই সকল কুমারীদিগের প্রতি অনিমেষ নয়নে তাকাইয়া

থাকে ও তাহাদের নৃত্যভঙ্গীর প্রশংসা করে। যে কন্যাটি যাহার মনোনীত হয়, ছুটিয়া গিয়া নৃত্যাবস্থা হইতে সে তাহার হস্ত ধারণ করিয়া লইয়া আসে। এই স্বেচ্ছা গ্রহণে কুমারীরা বা তাহাদের অভিভাবকবর্গ কোন প্রকার আপত্তি করে না। সঙ্গিনীদের হস্ত পরিত্যাগ করিয়া কন্যা তখন তাহার সহিত চলিয়া আসে; নৃত্য কিন্তু বন্ধ যায় না, সমানে চলিতে থাকে। এই সময়ে বাজনা বাজিয়া উঠে। কন্যার মাতা পিতা, বরের মাতা পিতার নিকট তখন ছাগল কাপড় কড়ি দিয়া কন্যাকে গৃহে লইয়া যাইতে অনুরোধ করিতে থাকে। তাহাদের দল তখন এই বিবাহ-প্রাঙ্গণ হইতে প্রস্থান করে। ইহার পর সাহেবদের "মধু চন্দ্রের" মত নব দম্পতী গৃহে অবস্থান না করিয়া কিছুদিন আনন্দে পাহাড়ে জঙ্গলে অতিবাহিত করিয়া আসে।

কামিনীর পিতাকে ডাকাইয়া ইন্দ্রের সহিত তাহার কন্যার বিবাহ-প্রস্তাব করিলাম। সে আমাদের এই ব্যাপারে আগ্রহ অবলোকন করিয়া আনন্দের সহিত সম্মতি প্রদান করিল।

যে দিন কামিনীর সহিত ইন্দ্রের পরিণয় সুসম্পন্ন হইল। তাহার পর দিন আমি বন্ধুবান্ধবের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া বাড়ী ফিরিলাম। কিন্তু চক্রধরপুরের সেই মিলন মাধুর্য্য কখনো ভুলিতে পারিব না। ইন্দ্র ও কামিনী আমার জিনিষপত্র গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া গেল। গাড়ী ছাড়িবার সময় তাহারা আধুনিক সভ্যতানুযায়ী কোন প্রকার সৌজন্য প্রকাশ করিতে অনভিজ্ঞ হইলেও এমন কয়েকটি আন্তরিক কৃতজ্ঞতার ভাব তাহাদের অঙ্গ-ভঙ্গীতে ফুটিয়া উঠিয়াছিল যাহা এ জীবনে আর কখনও দেখিব বলিয়া মনে হয় না।